প্রকৃতির সাজা

এই লেখকের অন্যান্য পুস্তক

বাপি রহস্য	...	১০৲
নির্মম	...	যন্ত্রস্থ
রেশমী সুতার ফাঁস		”
আবর্ত্তন	...	”
সংস্কার ও সংঘাত		”

প্রকৃতির সাজা

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী
উপনগরপাল, গোয়েন্দা বিভাগ, কলিকাতা

পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেব শশীভূষণ চক্রবর্তীর

— স্মৃতির উদ্দেশে

যত ঘটনা ঘটে, সমস্তই প্রকাশ পায় না। আবার যে সমস্ত ঘটনা পুলিসের কাছে নিয়ে আসা হয় তার সমস্তই আদালতে পৌছয় না। অধিকাংশই থেকে যায় খাতার পাতায়। এই সমস্ত ঘটনা সাধারণের কাছে পৌছে দেবার জন্যে এই বই লেখা। এরই কয়েকটি ঘটনা 'অচল পত্র' প্রভৃতি কাগজে আগে বেরিয়েছিল। বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

রক্ষক

কেশবদাস মাধবদাস একটা যৌথ কারবার। এই কারবারের দুই অংশীদার—কেশবদাস ঝুনঝুনওয়ালা আর মাধবদাস কেজরিওয়ালা। সম্পর্কে দুজনে শ্যালক আর ভগ্নীপতি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কারবার কয়লার। ছোটখাট আরও কয়েকটা এজেন্সিও আছে এই প্রতিষ্ঠানের। তবে মুখ্যত কয়লার কারবারি বলেই এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচিত। দুটি কয়লার খনি। দুটিই আছে ঝরিয়ায়। কাজের সুবিধের জন্যে দু জায়গায় অফিস আছে ঝরিয়াতে এবং কলকাতায়। দুজন মালিকের মধ্যে কেশবদাস থাকেন ঝরিয়ায় বছরের অধিকাংশ সময় আর মাধবদাস থাকেন কলকাতায়। তবে মাঝে মাঝে কেশবদাস কলকাতায় আসেন এবং কিছুদিন থাকেন এখানে আর মাধবদাসও ঝরিয়ায় গিয়ে থেকে আসেন বছরে কয়েকমাস। কেবল মাত্র কয়লার ওপর নির্ভর করে ব্যবসা চলে না। বাজার বিশেষ ভাল নয়। আর তা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের যে দুটো খনি আছে তার কয়লাও খুব উৎকৃষ্ট ধরনের নয়। আশানুরূপ লাভ হচ্ছিল না। তবে এটা ঠিক যে লোকসান নেই। ব্যবসার দস্তুরই এই। লেনদেনের মধ্যে কখন লাভ হয় কখন লাভ হয় না কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেখলে বোঝা যায় যে এক-রকম চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বাজার ভীষণ মন্দা চলছিল। কেবল যে কয়লার বাজার তা নয় সব কিছু ব্যবসাই যেন একটা টালমাটালের মধ্যে চলছিল। লোকেদের কেনবার ক্ষমতা নেই। কোন উদ্যমও নেই।

কেশবদাস মাধবদাসের দুই অংশীদার অনেক পরামর্শ করে স্থির করল যে ভাল খদ্দের দেখে কয়লার খনি দুটো বিক্রী করে দেবে। তারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিল। কয়েকজন খদ্দের এল। কথা বার্তাও চলল কিন্তু দাম কেউ ন্যায্য মত দিতে চায় না। সকলেই দাঁও কষতে থাকে। অংশীদাররা আরও পরামর্শ করে। কেশবদাস বয়সে বড় আর তার

ব্যবসার বুদ্ধি মাধবদাসের চেয়েও প্রখর। সে বলে যে বাজার এরকম বরাবর থাকতে পারে না। তার মনে হয় কাগজে যেমন দেখছে তাতে অতি শীঘ্রই একটা লড়াই বাধবে আর যদি একবার লড়াই বাধে তাহলে জিনিসের দাম চড়্‌চড়্‌ করে বেড়ে যাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নাকি দশ টাকা করে চালের মন হয়েছিল। খনি এখন বিক্রী কবার দরকার নেই।

শেষ পর্যন্ত মাধবদাসও কেশবদাসের কথায় সায় দেয়। তখন দুজনে ঠিক করে যে আরও কিছুদিন দেখা যাক। এত তাড়াতাড়ি বিক্রী করার কোন প্রয়োজন নেই। আবার আগের মতই চলতে রইল।

কথায় বলে ভগবান যাকে দেন তাকে আকাশ ফুড়ে দেন, না চাইতেই। সে তখন এই পাওনা নিযে কি করবে এইটাই হয় সমস্যা আর যাকে ভগবান মারেন তার ওপর হয় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

দুই অংশীদার তাদেব খনি বেচবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল কিন্তু তখন কোন খদ্দেরই তাদের আশা মত দাম দিতে চায়নি। এখন অনেকে যেচে আসতে লাগল খনি কেনবাব জন্যে আর দাম দিতে চাইল মালিকরা যে দাম দিতে চেয়েছিল তাব চেয়ে অনেক বেশী। শেষ পর্যন্ত কেশবদাসের কথাই ঠিক হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেল। জিনিস পত্রের দাম ক্রমান্বয়ে বাড়তে রইল। কাল যাব দাম ছিল চার পয়সা আজ তার দাম পাঁচ পয়সা আগামী কাল তার দাম যে ছ পযসা হবে না এ কেউ হলফ্‌ করে বলতে পারে না।

মাধবদাস কেশবদাসকে বললে—দাদা ভাগ্যিস খনি তখন ঝোঁকের মাথায় বিক্রী করা হয়নি। এখন এই কয়লার খনি আমাদের সোনার খনি হয়ে উঠবে।

কেশবদাস বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে—আরে ভায়া উত্তেজনায় কোন কাজ করা ঠিক নয়। আমার মাথার চুলে যে পাক ধরেছে এটা রোদ্দুরে পুড়ে নয় ভায়া এ অভিজ্ঞতায় এটা যেন। এই বলে হো হো করে হেসে উঠল। কেশবদাস আবার বললে—অভিজ্ঞতাই বল আর যাই বল না কেন সব কিছু ঐ মালিকের ইচ্ছে এই বলে ওপরে হাত

দেখিয়ে কপালে ঠেকাল। কি আশ্চর্য যখন মন প্রতি দু'পয়সা লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল এখন রাতারাতি মন পিছু আট আনা লাভ করা কিছুই নয়। বিক্রী আগের চেয়ে হু-হু করে বেড়েই চলেছে। এত লাভ স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না।

যেমন লাভের অঙ্ক বেড়েছে সেই সঙ্গে খরচাও বেশ বেড়েছে। কুলি মজুর আর আগের হিসেবে কাজ করতে চায় না। তাদের রোজ টাকায় চার আনা বাড়াতে হয়েছে। কারবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক খরচ বেড়েছে। বড় বড় কনট্রাক্ট পাবার জন্যে বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়। কেবল দেখা করলেই হয় না। তাদের খুশীও করতে হয়। অনেক সময় এই সমস্ত অফিসারদের অন্যায় আবদারও রক্ষে করতে হয়। তাঁরা যখন তখন গাড়ী চেয়ে পাঠান। পেট্রোল ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রল দিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠাতে হয়। কখন সারাদিন রেখে রাত্রে গাড়ী ছেড়ে দেন। সারাদিন গাড়ী ছাড়া কারবারের ক্ষতি হয়। ওই কারণে আর একটা গাড়ী রাখতে হয়েছে কলকাতায় অফিসে। অধিকাংশ কনট্রাক্ট কলকাতাতেই সম্পন্ন হয়।

এতদিন অফিস বলতে ছিল গদী। মেঝেতে একটা লম্বাচওড়া গদী পাতা আর তার ওপর একটা ফর্সা চাদর। কিন্তু এখন আর তা বলে হলে না। হাজার হোক এতদিন পরে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। দুচারজন অফিসার বাড়ীতে আসেন। এই অফিসারের মধ্যে আছেন রেল ও সৈন্যবিভাগের ওপরওয়ালারা। তাঁদের পক্ষে গদীতে বসে আলাপ আলোচনা করা অসম্ভব। বাগাড়ম্বরের যুগ। প্রথম দর্শনেই যদি নাক কুঁচকে যায় পরে আর সেই কোঁচকান নাককে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরান যায় না। কেশবদাস তাই বলে—পহ্‌লে দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারী। ঐ সমস্ত অফিসাররাই এ ভাগ্যলক্ষ্মীকে এনে দিয়েছেন। তাঁদের জন্যে ঠিকমত ব্যবস্থা না করলে চলবে কি করে। বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে তাই অর্ডার দেওয়া হল ভাল মেহগিনি কাঠের আসবাব। একেবারে আধুনিক

ডিজাইনের। অর্ডার দেওয়া হল ভাল কার্পেট আর সোফা সেটের।

কেবল কি এই? এখন কেশবদাস আর মাধবদাস সপরিবারে অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই থাকে। মাঝে মাঝে কাজ দেখবার জন্যে পালা করে দুজনে ঝরিয়ায় যায়। তাও দুএক দিনের জন্যে।

আগেকার দহিবড়ার যুগ আর নেই। এখন আধুনিক খাবার তৈরী করার জন্যে অনেকটাকা মাইনে দিয়ে দুজন লোক রাখতে হয়েছে। কোন না কোন অফিসারের দল রোজই আসে। তাদের আপ্যায়ন দরকার। তাদের জন্যে পানীয়ের ব্যবস্থাও আছে। এটাও নিশ্চয়ই চাই তা না হ'লে আজকালকার সমাজে কোন স্থান নেই!

যেমন মানুষের মনে দুশ্চিন্তাকে ডেকে আনতে হয় না। সে অজান্তেই এসে পড়ে অনাহুতের মতন। সেইমত খরচা একবার বাড়াতে থাকলে অনেক আনুষঙ্গিক খরচা নিজের থেকে এসে পড়ে। এদের জন্যেও কোন ভাববার দরকার হয় না। খরচায় খরচা বাড়ে।

কদিন থেকে কেশবদাস আর মাধবদাসের একটা নতুন চিন্তা হয়েছে। এতদিন হিন্দী আর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাংলা দিয়ে বেশ কারবার চলছিল কিন্তু এখন আর চলতে চাইছে না। বড় বড় অফিসাররা আসেন। তাঁরা নিজেদেব মধ্যে আলোচনা করেন ইংরিজিতে। বাঙ্গালী বা ভারতীয অফিসাররা অনেক সময সেই আলোচনায় যে অংশ কেশবদাস ও মাধবদাসের জানা দরকার সেটা তর্জমা করে শুনিয়ে দেন হিন্দীতে বা বাংলাতে। এতে আলোচনার সময় যথা সময়ে রসগ্রহণ সম্ভব হয় না। আসল আর তর্জমা এক হতে পারে না। অনেক সময় এমন হয়েছে যে যখন তর্জমা শুনে কেশবদাস রসাস্বাদন করে হেসে উঠল তখন মূল আলোচনা অন্য বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে হাসা উচিত নয়। কেশবদাসের এই দেরীতে হাসার জন্যে অফিসাররা একসঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে। কেশবদাসের মুখ অপমানে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। মাধবদাস যেন অপমানে মাটিতে মিশে যায়। অফিসাররা তাদের এই অবস্থা বুঝতে পেরে তাদের পিঠ চাপড়ে দেয়। কিন্তু কেশবদাস আর মাধবদাসের

মনে একটা প্রচ্ছন্ন আর্তনাদ বাইরে বেরিয়ে এসেও আসতে পারে না। তারা যেন মরমে মরে যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয়ের সদ্ব্যবহার করার পর অফিসাররা কেউ প্রকৃতিস্থ কেউবা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বিদায় দিলেন। কেশবদাস আর মাধবদাস তাঁদের এগিয়ে দিল গাড়ী পর্যন্ত। মুখ থেকে তরল পানীয়ের উগ্র গন্ধে দুজনে অস্থির হলেও তারা ভালভাবেই জানত যে বর্তমান সভ্যতায় এই অঙ্গটি ঠিকমত বজায় না রাখতে পারলে পান থেকে চুন অপসারিত হবার মত তাদের ভাগ্যাকাশ থেকে সৌভাগ্য সূর্য অকালে অস্তমিত হবে। তাই তারা অনেক অনিচ্ছা ও অসুবিধে সত্ত্বেও অফিসারদের গাড়ীতে পৌঁছে দিল।

অফিসাররা চলে যাবার পর দুজনে ঐ রাতের সমস্ত ঘটনায় আলোচনা করতে বসল। মাধবদাস বললে—দাদা, আমাদের ইংরিজি শিখতে হবে যেমন করেই হোক। এভাবে অফিসারদের কাছে বেকুব হয়ে থাকলে আর চলবে না। কেশবদাস একটু সেকেলে ধরনের ছিল। আজ পর্যন্ত সে ব্যবসার খাতিরে অনেককিছুই করেছে কিন্তু ইংরিজি শেখার কোন উৎসাহ তার ছিল না। মাধবদাসের পীড়াপিড়ি আর আজ অফিসারদের ঠাট্টা বিদ্রূপ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সে অগত্যা রাজী হয়ে গেল। যখন নাচতে নেমেছে তখন আর ঘোমটা দেবার চেষ্টা কেন। করলে পুরোপুরি করাই ভাল। এসব ব্যাপারে মাঝামাঝি রাস্তা কোন সমাধানই নয়। কিন্তু এখন ও আর ছোটছেলেদের মত বই শ্লেট নিয়ে স্কুলে যাওয়া যায় না। অল্প সময়ের মধ্যে ইংরিজি বলা শেখা আর ইংরিজি সভ্যতা রপ্ত করা যায় যাতে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। আর দেশী লোক যত শিক্ষিতই হোক তাকে দিয়ে কাজ চলবে না। একজন খাস বিলিতি সাহেবের কাছে শিক্ষা করার ব্যবস্থা হোক এই স্থির হল।

মাসে হাজার টাকা মাইনে দিয়ে খাঁটি ইংরেজের কাছে শিক্ষা চলল। ছমাসের চেষ্টায় ফল বেশ ভালই হল। সাহেবও তাদের বেশ উৎসাহ দিয়ে দেখাতে লাগল। আরও ছমাস পরে অর্থাৎ এক

বছর পরে কেশবদাস আর মাধবদাস সত্যিই ইংরিজি কায়দায় দুরস্ত হয়ে উঠল। প্যাণ্ট, সার্ট, টাই, কোট ছাড়া তারা আর সেই হাঁটুর ওপর ওঠা ধুতি পরে না। ধুতি, ফতুয়া এখন এ বাড়ীর পুরাণ চাকরের পোষাক। নতুন করে বয় বাবুর্চি রাখা হয়েছে। বাইরের বাড়ীতে এখন সব নতুন ঠাট। সেখানে পুরাণ কিছুর স্থান নেই। কথা বলার মাঝে মাঝে এখন কেশবদাস ও মাধবদাস ইংরিজির ফোয়ারা ছোটায়। বাড়ীতে আর দৈনিক বিশ্বামিত্র বা লোকমান্য আনা হয় না। এখন আসে স্টেট্সম্যান কাগজ। অন্যান্য ইংরিজি দৈনিক পত্রও এখন অচল। এখন কেশবদাস ও মাধবদাস মনে প্রাণে খাঁটি ইংরিজি ভক্ত।

ইংরিজি জানার জন্যে এখন ব্যবসারও অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন আর তাদের ফুরসৎ নেই। রোজই একটা না একটা পার্টিতে যেতে হয়। কারবারের খাতিরে যেতে হয় এবং ইদানিং তাদের আরও উন্নতি হয়েছে। তারা মদ্যপান করতে শিখে ইংরিজি কায়দার শেষ অধ্যায়ের পাঠ সম্পূর্ণ করেছে।

সম্পূর্ণ ইংরিজি কায়দায় অফিস। বাইরে পেতলের তকমা আটা উর্দি পরা বেয়ারা। দরজার পাশে ইংরিজিতে লেখা পার্টনারদের নাম কেশব ড্যাস ও ম্যাডাব ড্যাস।

কেশবদাস মাধবদাস অত অল্প বয়সের মধ্যে অত ফরওয়ার্ড হয়ে উঠেছে দেখে সকলেই অবাক হয়ে যায় কিন্তু এততেও কেশব বা মাধবের পূর্ণ শান্তি কোথায়? অনেক পার্টিতে আজকাল সস্ত্রীক যাবার নিমন্ত্রণ হয়। কেশব বা মাধব অত ফরওয়ার্ড হলে কি হবে? তাদের বাড়ীর মেয়েরা ত সেই আগেকার মতই রয়ে গেছে। প্রথম প্রথম মেয়েদের না নিয়ে যাওয়াই দুজনে ঠিক করেছিল কিন্তু পার্টিতে অন্যান্য মেয়েদের সমালোচনায় পড়ে শেষে কেশব ও মাধব তাদের স্ত্রীদেরও পার্টিতে নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। পার্টিতে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। না পারে কারো কথা বুঝতে, না পারে আধুনিকাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। আবার নতুন করে সমস্যা দেখা দিল।

কেশবদাস আর মাধবদাসের সম্মানে ঘা লাগল। বটে, তাদের স্ত্রীরা হেয়র পাত্র! এ কখনও হতে পারে না। অসম্ভব। সেই দিনই ঠিক হয়ে গেল একজন খাঁটি বিলিতি মেম সাহেব। মাসে আটশ টাকা করে দিয়ে দু'জনের স্ত্রীকে ঘষে মেজে ঠিক করার জন্যে!

দেখতে দেখতে বাড়ীটা একটা ইংরিজির ছোট সংস্করণ হয়ে উঠল। মেয়েদের জন্যে কেবল মেম সাহেব রাখলেই চলল না। ভ্যানিটি-ব্যাগ, চুল ছোট করে কাটা, লিপষ্টিক এবং অন্যান্য প্রসাধনের ছড়া ছড়ি। দেশী জিনিস ভাল নয় সবই বিলিতি এবং সমস্ত আদব কায়দাই বিলিতি হতে লাগল।

মেয়েরা বেশ তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যে তারা পরিষ্কার বিলিতি উচ্চারণও শিখে ফেলল। হাই-হিল জুতো পরে হাটার কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। কেবল গাউন বাদ দিয়ে আর সমস্তই ব্যবহার হতে লাগল।

কেশবদাস ও মাধবদাস প্রথম প্রথম লুকিয়ে চুরিয়ে হোটেলে খেতে যেত কিন্তু এখন আর কোন বাঁধা নেই। তারা এখন প্রকাশ্যে সস্ত্রীক হোটেলে খেতে যায়। প্রায়ই হোটেলে পার্টি থাকে। কোন-দিন বা কক্‌টেল। আগে মদের গন্ধে তাদের বমি উঠে আসত। এখন কি পরিবর্তন! স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদের সদ্ব্যবহার করতে শিখেছে। এখন মদ তাদের নিত্য সঙ্গী। এমন একটা উপাদেয় বস্তু কেন যে তারা এতদিন ব্যবহার করেনি তার জন্যে আফশোষ হয় আর এতদিন ব্যবহার না করাতে যে ক্ষতি তা পূরণ করার জন্যে দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠেছে।

এখন বিভিন্ন বিভাগের অফিসার, অন্যান্য বড় ঠিকাদার সস্ত্রীক কেশবদাসদের বাড়ীতে প্রায়ই আসে। ইংরিজিতে আলোচনায় এখন আর কোন অসুবিধে নেই। কেশবদাস ও মাধবদাস তাদের স্ত্রীদেরও নিয়ে অনেক জায়গায় রিটার্ন ভিজিট দেয়। অনেক সময়ে কেশবদাস ও মাধবদাসের স্ত্রীরা নিজেরাই অনেক নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যখন কেশব-দাস ও মাধবদাস বিশেষ কাজে আটকে পড়ে।

মাঝে মাঝে কেশবদাস ভাবে কালের প্রভাবে তারা কোথায় এসে পড়েছে। কোথায় চলেছে তারা ? তার বাবা, ঠাকুরদা-রা চা পর্যন্ত খেতেন না, হাঁটুর ওপর ছাড়া হাঁটুর নিচে কোনদিন ঝুলিয়ে কাপড় পরেন নি। তাঁরা ত কোনদিন ব্যবসার জন্যে এমনভাবে তাঁদের যা কিছু নিজস্ব তা বিসর্জন দেননি। এখন তারা যা করছে এটা কি ঠিক ? এখন ফেরবারও কোন রাস্তা নেই। যে দেশে পদ্মিনী, তারাবাঈ, সংযুক্তার মত রমণীরা আদর্শের জন্যে প্রাণকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছে সেই সমাজেরই মেয়েরা তাদের স্ত্রীরা আজ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে এটা সমীচীন কিনা ? কেশবদাসের মনটা খারাপ হয়ে যায়। তার মনে কোথায় যেন একটা আঘাত লাগে।

মাধবদাস ওসব কোন চিন্তাই করে না। তার মতে কালের চাকা সব সময়ে এগিয়ে চলেছে। সেই অগ্রগতিকে কেউ জোর করে ধরে রাখতে পারে না বা পিছিয়ে দিতে পারে না। প্রগতি কালকেই আশ্রয় করে এগিয়ে যায়। প্রগতি না থাকলে আজ মানুষ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর যুগে বাস করত। সংযুক্তা, তারাবাঈয়ের সময় আর এখনকার সময় একনয়। কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে হবে। পেছনে ফিরে চাইবার সময় কোথায় ? সে কেশবদাসকে বোঝায় যে মানুষের ধর্মই হল অতীতকে আকড়ে রাখার প্রচেষ্টা। চিরাচরিত প্রথা থেকে নতুনের দিকে সে সহজে যেতে চায় না। অজানা আশঙ্কায়। তাদের এ আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তাদের ব্যবসা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী ফুলে ফেঁপে বড় হয়েছে। ব্যবসায় তাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ব্যবসায়ী সঙ্ঘের তারা এখন প্রেসিডেণ্ট। দিনের পর দিন এখন তারা এগিয়ে চলেছে। তাদের বাড়ীর মেয়েরা এখন সমাজের আদর্শ স্থানীয়া। তাদের বাড়ীব ছেলেরা উচ্চশিক্ষা পাবার জন্যে বিদেশে যাচ্ছে। এখন কি আর সেই পুরাণ দিনকে ফিরে পেয়ে লাভ আছে ? না কখনই না।

কেশবদাস ও মাধবদাসের এখন আর এক দণ্ডও ফুরসৎ নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি চব্বিশ ঘণ্টায় দিন না হয়ে যদি তিরিশ ঘণ্টায়

দিন হত তাহলে হয়ত ভাল হত। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় তার আর হিসেব থাকে না। জনসংযোগ রক্ষে করতে তারা আজকাল নাজেহাল। দুজনের জন্যে দুটি সেক্রেটারি রাখতে হয়েছে। এই সেক্রেটারিরা কেশবদাস ও মাধবদাসের বিশেষ বিশেষ জায়গায় কি বক্তৃতা দিতে হবে তাও লিখে দেয়। এই কারণে সেক্রেটারিরা বেশ ভাল মাইনে পান।

কারবারে এখন আয় অচিন্তনীয়। কেশবদাস আর মাধবদাস বর্তমানে একটা 'ফাউণ্ড্রি' খুলবে বলে মনে করেছে। যুদ্ধের বাজারে কিছু লোহা লক্কড় সরবরাহ করতে পারলে মোটা টাকা পাওয়া যাবে। 'আয়রণ এণ্ড স্টীল কনট্রোলার' মিঃ সাহনী তাদের কথা দিয়েছেন যে পারমিটের সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

যুদ্ধ এখন পুরাদমে চলছে। এখন যদি কেউ ধূলোও মুঠো করে ধরে সময়ের গুণে তা সোনা হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় আর আসবে না। কখন যে পট করে যুদ্ধ থেমে যাবে তখন আর এ সুযোগ পাওয়া যাবে না। সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। সুযোগ আসামাত্র তার সদ্ব্যবহার যে করতে পারে সেই সফলকাম হতে পারবে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই হচ্ছে আসল ব্যাপার।

কেশবদাস আর মাধবদাস সেই সুযোগ সুরু থেকেই সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছে। 'ফাউণ্ড্রির' ব্যাপারেও তারা পিছিয়ে রইল না। যায়গা দেখা হয়ে গেছে। প্ল্যান পাশ হয়ে গেছে, জমির বায়না দেওয়া হয়েছে। এখন কেশবদাস আর মাধবদাসের বিশ্রাম নেবার সময় নেই। সময়মত খাওয়া হচ্ছে না। তিনমাসের মধ্যে কারবার চালু করতে হবে। রোজই ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নানা প্রকার আলোচনা চলছে সকালে, দুপুরে, আর সন্ধ্যায়।

হঠাৎ—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। একদিন কেশবদাস আর মাধবদাস তাদের অফিসে বসে নতুন 'ফাউণ্ড্রির' বিষয়ে আলোচনা করছে। দুজনের মুখেই বেশ কৃতার্থের ছাপ। কথার মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে আত্ম প্রত্যয়ের। বিজয় লক্ষ্মী তাদের ঘরে বাঁধা আছে। সেই

বিজয় লক্ষ্মীকে আরও দৃঢ় ভাবে বাধবার জন্যে যত প্রচেষ্টা। ভাগ্য বিধাতা অলক্ষ্যে বোধ হয় হাসছিলেন। একটা জরুরী টেলিগ্রাম ডাক-পিয়ন এসে দিয়ে গেল। এ ধরনের জরুরী টেলিগ্রাম কতই আসে। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র কেশবদাস খুলল না। সে তার আলোচনার বিষয় শেষ করে টেলিগ্রামটা খুলে পড়ে যেন তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলল। তার ফ্যাকাশে মুখ দিয়ে কোনই কথাই বেরুল না। নিঃশব্দে সে টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিল মাধবদাসের দিকে। মাধবদাস একবার পড়ার পর আরো তুবার পড়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে—অ্যাঁ কয়লার খনিতে আগুন ? ইঞ্জিনিয়ার আব চার পাঁচজন চাপা পড়ে মারা গেছে ? হাঃ হাঃ হাঃ এখনই আগুন লাগল ? আর কদিন পবে লাগতে পারল না ?

সমস্তটা হেয়ালীর মত শোনাতে লাগল। 'ফাউণ্ড্রির' ইঞ্জিনিয়ার টেলিগ্রামটা নিয়ে পড়লেন—ঝরিয়ায় এক নং কোলিয়ারীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। কোলিয়ারীর ইঞ্জিনিয়ার আর অন্য চার পাঁচজন লোক চাপা পড়ে গেছেন। আগুন তখনও জ্বলছে। অনেক চেষ্টা করেও আগুন নেভান যাচ্ছে না। আশে পাশে অন্যান্য কোলিয়ারীও খুব চিন্তিত। তাদেরও যে কোন সময়ে বিপদ হতে পারে।

কেশবদাস টেলিগ্রামটা ছো মেরে তুলে নিয়ে পড়ে ফেলল এক নিঃশ্বাসে। টেলিগ্রামটা রেখে দিয়ে আবার তুলে নিল। আবার পড়ে রেখে দিল। এই রকম তিন চারবার করে বললে—আগুন লাগল ত ঐ এক নম্বরেই লাগল। এইটাই যে তাদের আশা ভরসার স্থল। কেশবদাস উঠে দাঁড়াল। আর একবার টেলিগ্রামটা পড়ে হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল। সে হাসি আর থামতে চায় না। সকলে সেই দিকে চেয়ে আছে। কেশবদাস মাধবদাসকে পায়ে একটা ছোট চাপড় মেরে বললে—লাগুক আগুন। জ্বলুক, জ্বলুক, ওকে আর নিভবার চেষ্টা করে কাজ নেই। আমার বুকের ভেতরে আরও বড় আগুন জ্বলছে। আগে তাকে নিভতে হবে। এস ভায়া চুপ করে দাড়িয়ে থেক না। ভাল ইংরিজি মদ আনো, দেরী করো না. আমি আজ মদ খাব আমি আমার বুকের আগুন নেভাব।

(২)

বিপদ যখন আসে তখন সে বিপদের বেড়াজালকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও একলা আসে না। কোলিয়ারির আগুনের ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতে আর একটা বিরাট ধাক্কা এসে পড়ল। এ ধাক্কায় ধারাশায়ী না হয়ে আর কোন রাস্তা নেই। ইনকাম ট্যাক্স অপিস থেকে দশলক্ষ টাকা ট্যাক্স দাবী করে রেজিস্ট্রি চিঠি এসেছে। একেবারে গোদের ওপর বিষফোড়া।

কেশবদাস ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মাধবদাসের দিকে। তার দৃষ্টির করুণ ভাব যেন নীরব ভাষায় মাধবদাসকে বলছে—বাঁচাও, আমি হার মেনেছি।

মাধবদাস কি বলবে, তার অবস্থাও ঐ একই রকম। সে বাইরে কোন প্রকাশ করছে না বটে তবে অন্তরে তার যে কি তোলপাড় চলছে তা আর বলে বোঝান যায় না। সবচেয়ে বড় আর ভাল কোলিয়ারীটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এই কোলিয়ারীর আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কপালেও আগুন লাগল। সবই ভাগ্যের পরিহাস। মানুষ কি অসহায়!

কেশবদাস বললে—ব্যাঙ্কে ত মোট আছে আটলাখ। বাজারে যা দেনা আছে সব মিটিয়ে একলাখ টাকা থাকতে পারে অবশিষ্ট। এখন ইনকাম ট্যাক্সের টাকা কোথা থেকে দেব? ইনকাম ট্যাক্সের কেসটা চলছিল অনেকদিন ধরে। একেবারে পনর লাখ ট্যাক্স ধরেছিল। আশা ছিল অনেক কমবে কিন্তু মোট পাঁচ লাখ কমেছে। দশ লাখ টাকাত দিতেই হবে। কি করা যায় বল। দু নম্বর কোলিয়ারী বাড়ী ঘর সব বেচেও কি ঐ টাকা হবে! বাড়ী যদি বেচি ত থাকব কোথায়? স্টাইল যা বেড়েছে সে ত আর বজায় রাখা যায় না। কার পরামর্শ নেওয়া যায় বল। আমি ত কিছু ভেবে পাচ্ছিনা। কাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলা যায়।

মাধবদাস অনেকক্ষণ ভেবে বললে—আচ্ছা আমাদের উকীলবাবু

মুখুজ্যে মশাইকে বললে কেমন হয়। উনিত আমাদের অনেক বিপদে পরামর্শ দিয়েছেন আর আমাদের অনেক খবরও রাখেন। লোকটা আমাদের হিতৈষীও বটে।

কেশবদাস মাধবদাসের কথায় রাজী হয়ে মুখুজ্যে মশাইকে খবর পাঠাল। এই মুখুজ্যে মশায়ের একটু ইতিহাস জানা দরকার। এঁর প্রধান কাজ হল সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যত বেনামী চিঠি ছাড়া হয় তার মুসাবিদা করা। মিথ্যাকে সত্য করবার যত অপচেষ্টা তাতে মুখুজ্যে সিদ্ধহস্ত। তাকে দেখলে মনে হবে যে তেমন গোবেচারা লোক বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। কথায় কি বিনয়! বিড়ি ছাড়া সিগারেট খান না। যত ঘৃণ্য সমাজ বিরোধী কাজ তার উপদেষ্টা এই মুখুজ্যে। কখন কোন জাল দলিল করতে হবে, কখন কোন সৎ কর্মচারীকে বিপথে ফেলতে হবে এই সব ব্যাপারে মুখুয্যে স্বনামধন্য। সামনে এমন দেখান যে একপেয়ালা চা খাওয়াতে কত অপরাধ কিন্তু আড়ালে পেগের পর পেগ মদ তিনি উড়িয়ে দেন। মুখুজ্যে যেমন কেশবদাসদের উপকার করেন তেমনি তিনি তাদের কাছে উপকৃতও বটে।

তাদের কাছ থেকে ডাক পেয়ে মুখুজ্যে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করে কেশবদাসদের বাড়ীতে এসে হাজির হল। কেশবদাস ও মাধবদাস দুজনেই তখন ঘরে বসে ছিল। তারা মুখুজ্যেকে অভ্যর্থনা করে বসাল। তার পর দরজা বন্ধ করে নিভৃতে আলোচনা চলল। আলোচনার বিষয়বস্তু হল কেমন করে ইনকাম ট্যাক্সের এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। মুখুজ্যেকে তারা তাদের কোলিয়ারীতে দুর্ঘটনার কথাও জানাল। মুখুজ্যে এখানে আসবার আগে এই রকম একটা কিছু অনুমান করেছিল। এই লাইনে সে ত আর নতুন নয় তার অভিজ্ঞতাও প্রচুর।

মুখুজ্যেকে সব কথা বলে কেশবদাস যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তার বদ্ধমূল বিশ্বাস যে মুখুজ্যে একটা রাস্তা বার করতে পারবে। এই আশাতে কেশবদাস সমস্ত বলবার পর মুখুজ্যের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মুখুজ্যে বড় চতুর, বড় ঘোড়েল লোক। সমস্ত শুনে সে ভ্রূ কুঁচকে চোখবুজে খানিকক্ষণ বসে রইল তার পর চোখ খুলে একবার চারদিক দেখে নিয়ে নীচু স্বরে বললে—"আমি ত ভেবে একটা রাস্তাই পাচ্ছি। আচ্ছা ইনকাম ট্যাক্সের চিঠিটা ওদেব অফিস থেকে কবে ছেড়েছে ?"

মাধবদাস সেই চিঠিটা বার করে দেখে বললে—আজ থেকে পাঁচ দিন আগে। এই বলে চিঠিটা দেখাল।

তখন মুখুজ্যে বলল—ঐ চিঠিটা যেদিন অফিস থেকে ছাড়া হয়েছে তাব অন্ততঃ আবও মাসখানেক আগে বা আরও আগে যদি সম্ভব হয় কোম্পানীব একটা মিটিং দেখাতে হবে আর তাতে 'রেজলিউশন' দেখাতে হবে কেশবদাস মাধবদাস অন্য নামে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সব জায়গায় এমনকি ব্যাঙ্কেও এডভাইস করতে হবে একাউণ্টস্ ট্রানসফার করাব জন্যে।

কেশব দাস—আগেব তারিখ দিয়ে এ সমস্ত কি করে সম্ভব হবে ?

মুখুজ্যে—সে ভাবনা আপনাব নয়। আমাকে যখন আপনি বিশ্বাস করে সমস্ত কথা বলেছেন, সে ভার আমাব। লেখা পড়া ত কেবল ধান চাল দিয়ে শিখিনি, বাবা, মা খরচা করেই পড়িয়েছিলেন। এখন আমাব এই প্রস্তাবে যদি আপনাবা রাজী থাকেন তাহলে দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে কার নামে এই ফার্মটা কববেন। আমাকে জানালে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। দশ লাখ টাকা আর দশ বছরে কেন দশ জন্মেও আদায় হবে না। আমার নাম হরেন মুখুজ্যে। প্রয়োজনে আমি মরা মানুষের মুখ দিয়ে কথা বলাই। আপনাদের পাঁচজনের শুভেচ্ছায় অনেকেই আমাকে জানে আর প্রয়োজনে আমাকে ডাকে। খালি একটা কথায় আমি অতবড় একটা কাজে হাত দেব আমার পারিশ্রমিকটা যেন ন্যায্য হয়, আর কিছু নয়।

কেশব দাস—আপনাকে কি কখন বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ করতে হয়েছে আজ পর্যন্ত ?

মুখুজ্যে—জিব কাটিয়া আরে রাম! আমি কি সে কথা বলছি, না কোন দিন বলেছি। আপনাদের মত লোকের কাছ থেকেই ত

আমি সব সময়ে উপকার পেয়ে আসছি। সে কথা অস্বীকার করলে যে আমার নরকেও স্থান হবে না।

কেশব দাস তখন বললে—ঠিক আছে মুখুজ্যে মশাই, আজকের দিনটা আমরা একটু চিন্তা করে দেখি। কাল সকালে আপনাকে জানাব।

'খুব ভাল কথা' বলে মুখুজ্যে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

মুখুজ্যে যাবার পর কেশবদাস ও মাধবদাস পরস্পর আলোচনায় বসল মুখুজ্যের কথা নিয়ে। ফার্মের নাম বদলে ফেলার সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই কিন্তু কার নামে বদলান হবে এইটাই হল এখন সমস্যা।

অনেক আলোচনা করে স্থির করল কেশব দাস। সে বললে—যদি বেনামীই করতে হয় তাহলে আমাদের নামের আর কোন সংস্রব রাখব না। কেশবদাস মাধবদাসও যা আর মাধবদাস কেশবদাসও তাই। সম্পূর্ণ অন্য নাম দিয়ে বেনামী করা হবে। তখন ঠিক হল দুই অংশীদারের দুই ছেলের নামে এই ফার্মের নাম রাখার প্রস্তাব দেবে। এর নতুন নাম হবে বেহারীমল মোহনলাল। কেশবদাস আরও বলল যে এই কারবার দেখবার ভার দেওয়া হোক মুখুজ্যেকে একটা পাওয়ার অফ্ এটর্নী দিয়ে। যা ঝঞ্ঝাট মুখুজ্যে পোয়াক। তাদের ঝরিয়ার ও কলকাতার বাড়ী দুটো মুখুজ্যের নামে বিক্রী দেখিয়ে এখন তারা কিছুদিন রাজপুতনায় সপরিবারে গা ঢাকা দিক। মুখুজ্যেকে তারা বিশ্বাস করে। সময় আর কিছু ভাল হলে তারপর আবার ফিরবে এখানে।

মাধবদাস সমস্ত কিছুতেই রাজী হল। কেবল সে বল্‌ল যে সে কিছুদিন মুখুজ্যের কর্মচারী হিসাবে এখানে থাকবে। কেশবদাস সকলকে নিয়ে টানা মোটরে রাজপুতনায় যাক। মাধবদাস এখানে থেকে দেখতে চায় কি ঘটে। কেশব দাস প্রথমে একটু আপত্তি জানাল বটে কিন্তু শেষে মাধবদাসের কথায় রাজী হয়ে গেল।

পরদিন মুখুজ্যেকে খবর দিয়ে আনা হল।—

পূর্ব দিনের মত আবার রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা বসল। কেশব-

দাস মুখুজ্যেকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানাল। বেহারীমল মোহনলাল নামটা মুখুজ্যের বেশ পছন্দ হল। মুখুজ্যে বলল যে কোম্পানীর নাম বদলাবার রেজলিউশন, তার নোটিশ ও অন্যান্য যা কিছু করার দায়িত্ব সে নিজে নেবে; এ বিষয়ে কোন চিন্তা কেশবদাস বা মাধবদাসের থাকবে না। ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাও সে করবে। এই ভাবে ইতিপূর্বে আরও দু এক জায়গায় কাজ সে করেছে এবং কোন জায়গায় কোন অসুবিধে হয় নি।

এই আলোচনার পর কেশবদাস মুখুজ্যেকে বললে—দেখুন আমরা আপনাকে বেশ বিশ্বাস করি। আমি আর একটা কথা আপনাকে অনুরোধ করতে চাই এবং আশাকরি আপনি আমার কথায় রাজী হবেন।

মুখুজ্যে প্রথমটায় ঠিক ধরতে পারেনি কি কথা কেশবদাস বলতে চায়। সে কেশবদাসের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর বললে—বলুন আপনার কি বলার আছে। আমার দ্বারা সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই করব।

কেশবদাস আর কোন ভণিতা না করে বললে—দেখুন আমরা চাই যে ঝরিয়াতে যে অন্য কোলিয়ারীটা আছে সেটা আর আমাদের কলকাতা আর ঝরিয়ার বাড়ী দুটো আপনার নামে বেনামীতে বিক্রী দেখান থাক আর আপনাকে আমরা আমাদের পরস্পর বোঝাপড়ার ওপর পাওয়ার অফ্ এটর্নী-দেব আমাদের হয়ে কাজ কর্ম দেখার জন্যে। এটা অবশ্য আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। এ প্রস্তাব আপনি কেমন মনে করেন?

চতুর মুখুজ্যে এই প্রস্তাব অতি উত্তম তা মনে মনে বেশ বুঝতে পেরেছিল। মুখে সে ভাব ব্যক্ত না করে বললে—আমায় আবার এ বিষয়ে কেন টানাটানি করবেন। আমার প্রাকটিস করবারই সময় হয়ে ওঠে না তার ওপর আবার এই দারুণ বোঝা ঘাড়ে চাপাতে চান।

কেশবদাস ও মাধবদাসের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মুখুজ্যে রাজী

হল আর সমস্ত দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র দু'দিনের মধ্যে ঠিক করে ফেলবে বলে নমস্কার করে বিদায় নিল।

যাবার সময় কেশবদাস বললে—একটা কথা আপনাকে বলা প্রয়োজন।

মুখুজ্যে জিজ্ঞাসুনেত্রে ফিরে দাঁড়াল।

কেশবদাস তার দিকে চেয়ে বললে—আমরা কয়েকমাসের জন্যে এই কারবার থেকে সরে থাকতে চাই। আমরা সবাই মিলে রাজপুতানায় যাব বলে ঠিক করেছি কিন্তু মাধবদাস এখানে থাকতে চায়। তার ইচ্ছে সে আপনার ফার্মে অর্জুনদাস নাম নিয়ে কর্মচারী হিসেবে থাকবে। এতে আপনার কি মত?

মুখুজ্যে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মুখুজ্যে মনে মনে হিসেব করে দেখতে রইল মাধবদাসের এটা আবার কি নতুন চাল। সে তারপর বললে—ঠিক আছে তাই হবে। আপনাদের কারবারে আমি ত অছি হয়ে থাকব। আপনারা যা মনে করবেন তাই হবে। তারপর মুখুজ্যে দুদিনের সময় নিয়ে চলে গেল।

(৩)

মুখুজ্যের পরামর্শ মত সমস্ত কাজ ঠিক হয়েছে। অঙ্কের হিসেবের মত মিলে গেছে। কেশবদাস বাড়ীর সকলকে নিয়ে রাজপুতানায় চলে গেছে। ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা কেশবদাস ট্রান্সফার করেছে অন্য ব্যাঙ্কে আর পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্জুনদাসের নামে একটা অন্য ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলেছে। হঠাৎ কোন প্রয়োজন হলে যাতে সেই টাকাটা সে পেতে পারে।

মুখুজ্যে এখন দলিলে লেখাপড়া মত যথার্থ মালিক। অর্জুনদাস তার বেতন ভোগী কর্মচারী মাত্র। মুখুজ্যে মালিক হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ কর্মচারীদের সকলকে ছাড়িয়ে সমস্ত নতুন লোক নিয়োগ করেছে। অর্জুনদাস তাকে একবার বলেছিল এই সমস্ত পুরাণ লোকদের হয়ে।

তাতে মুখুজ্যে জবাব দিয়েছিল—আমি যা কিছু করছি আপনাদের মঙ্গলের জন্যে। পুরাণ লোক থাকলে আপনাদের বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই উত্তর শোনার পর অর্জুনদাস আর কোন কথা বলেনি। অর্জ্জুনদাস যে মুখুজ্যের বেতনভোগী কর্মচারী সেটা আইনতঃ প্রমান করবার জন্যে মুখুজ্যে তাকে মাসে ২৫০৲ টাকা মাইনে দেয় এবং অর্জুনদাসকে খাতায় সই করে নিতে হয়।

এইভাবে প্রায় একবছর কাটল। ইন্‌কামট্যাক্স থেকে কেশবদাস বা মাধবদাসের কোন হদিসই পেল না। মুখুজ্যেকে জিজ্ঞেস করলে সে জানে না বলে বলে দিয়েছে। খাতা পত্র সবই এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে মুখুজ্যেকে কোন উপায়ে ধরার সুযোগ নেই। মুখুজ্যে এতটা পাবার আশা কোনদিনই করেনি। এতদিন সামান্য কিছু প্রণামীতেই সে খুসী ছিল। এখন সে মূল নৈবিদ্যের অধিকারী। সে চেয়েছিল কেবল বেণী আর পেয়েছে বেণীর সঙ্গে মাথাও। কারবারে লাভ আগের অপেক্ষা ভালই হচ্ছে। সমস্ত লাভ এখন তার নিজের। কেশবদাস বা অর্জুন-দাসের সঙ্গে সে কোন আলোচনাই করে না। কেশবদাস কয়েকটা চিঠি দিয়েছিল মুখুজ্যেকে রাজপুতানা থেকে। মুখুজ্যে তাকে জানিয়েছে যে ইন্‌কামট্যাক্সের ব্যাপারটা এখনও মেটেনি। তারা এই ফার্মের ওপর কড়া নজর রেখেছে এমনকি চিঠিপত্রও অনেক সেন্সর হচ্ছে। এই অবস্থায় কেশবদাস যেন তাকে কোন পত্র না লেখেন। সমস্ত ঠিক আছে। ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই।

অর্জুনদাসের সঙ্গে মুখুজ্যে আজকাল ভাল ব্যবহার করে না। অর্জুনদাস ব্যবসার ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে মুখুজ্যে তাকে বলে যে সে যেন ভুলে না যায় যে সে এখন মুখুজ্যের একজন বেতনভুক কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই নয়। মুখুজ্যে নিজে থেকে এ কারবারে মাথা গলাতে আসে নি। বেশী কিছু হলে সে সমস্তই ফাঁস করে দেবে।

সমস্ত ফাঁস করে দেবে এই কথায় অর্জুনদাসও কেমন ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে আর কোন তর্ক করতে চায় না। তর্ক করেও না। অর্জুনদাস মুখুজ্যের ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ে কেশবদাসকে লিখে

জানায়। কেশবদাসও চিঠিতে জানায় যে এখন সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কোর্টে গিয়ে নালিশ করার কথা চিন্তা করা যায় না। মুখুজ্যে ভাল ভাবেই জানে। সেই সুযোগই সে পূর্ণমাত্রায় নিয়েছে। কেশবদাস আর অর্জুনদাস বেশ ফাঁপরে পড়ল।

অর্জুনদাস আগে বেশ স্ফূর্তিবাজ লোক ছিল। এখন অবস্থার বিপাকে পরে মুখুজ্যের ব্যবহারে তার আর সে স্ফূর্তি নেই। পুরান কর্মচারী যারা ছিল তারা অর্জ্জুনদাসকে চিনত। তারা এখন আর কেউ নেই। এখন সব নতুন মুখ। তারা অর্জুনদাসকে মাইনে করা কর্মচারী বলেই জানে। সব কথা ভাবতে ভাবতে অর্জুনদাসের চোখে জল এসে যায়। অর্জুনদাস আর ভাবতে পারে না। মুখুজ্যের তাঁবেদারী আর তার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে অর্জুনদাস ভাবে যে তার কাছে যে টাকা আছে তাই দিয়ে সে কোন একটা ব্যবসা করবে। কিন্তু কোন্ ব্যবসা করবে? ব্যবসার মধ্যে সে ত কেবল কয়লার ব্যবসাই জানে কিন্তু সে ব্যবসা ত আর করবার উপায় নেই। এখন তাহলে সে কি করবে? নাঃ সে আর ভাবতে পারে না। ক্ষোভে, দুঃখে তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। সে আর কিছুই দেখতে পায় না। যতবার চোখ মোছে, ততবার কোথা থেকে জল এসে চোখ ভরে ওঠে। কষ্টের কথা কাকেই বা জানাবে? যে বাড়ীতে সে, কেশবদাস এবং তাদের পরিবার বর্গ ছিল আজ সেখানে মুখুজ্যে পরিবার আছে। অর্জুনদাস এখন একজন নগণ্য কর্মচারী। সে এখন মুখুজ্যের দয়ায় এই বাড়ীরই বাইরের অংশে একখানা ঘরে থাকে। এই ঘরে সরকারী কর্মচারীরা অনেক সময় তাদেরই অতিথি হিসাবে কতদিন থেকেছে। তার মনে পড়ল বেলাণ্ড সাহেবকে। কত বড় লম্বা চওড়া চেহারা, একেবারে লাল টকটকে চেহারা, খাঁটি ইংরেজ। কি মদটাই না খেতে পারত! এই বেলাণ্ড সাহেবই তাদের ভাগ্য ফিরিয়েছিল। নেশার ঝোঁকে একটা বড় কনট্রাক্ট তাদের দিয়েছিল। সেইটাই ছিল তাদের প্রথম কনট্রাক্ট। তার মন অতীত দিনের স্মৃতির মধ্যে ঘুরতে রইল। মনে পড়ল আর্মষ্ট্রং সাহেবকে। সব সময় হাসি খুসী ভাব।

বিশেষ করে তাকে কত ভালই না বাসত। নিজের দেশে নিয়ে যাবার জন্যে তাকে কতবার বলেছিল। বেলাগু এবং আর্মষ্ট্রং দুজনেই এই ঘরে থেকেছে। এরা দুজনেই ছিল সৈন্য বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। অতীতের সুখ স্মৃতিতে বিচরণ করার মত আনন্দ আর নেই। অর্জুন-দাসের মন কখন যেন সেই সুদূর অতীতে চলে গেল। কোথায় গেল সেই মাধবদাস যার গলার আওয়াজ পেয়ে কর্মচারীরা সব সময়ে তটস্থ হয়ে থাকত। যার মুখের কথার অপেক্ষায় কত লোক অধীর আগ্রহে বসে থাকত। সে কখন ৪০০ নং ক্লাবে যাবে তা জানবার জন্যে তার গুণগ্রাহীরা প্রহরে প্রহরে টেলিফোন করত। কোথায় তখন মুখুজ্যে আর কোথায় তার বাবুয়ানী? ভাবতে ভাবতে অর্জুনদাসের মন থেকে মুখুজ্যে আর বর্তমান সব কিছু মুছে গেল। সে অতীতের স্বপ্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ধীরে ধীরে অর্জুনদাস ফিরে এল তার বাস্তব জগতে। তার মন অবসাদে ভরে এল। সে অকারণে চঞ্চল পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। তার মনে হল, এ-সমাজ, এ-শিক্ষা, এ-দীক্ষা সমস্ত মিথ্যা। তার মনের মধ্যে এক বিরাট শূণ্যতা এসে তাকে ঘিরে ধরল। আজ সে বড় ক্লান্ত। জীবন যুদ্ধে সে আজ হার মেনেছে। আজ তার শোচনীয় পরাজয়।

যতই দুঃখ, কষ্ট হোক, দিন চলতে লাগল। রোজ যেমন দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন হয় সেইভাবে অর্জুনদাসের সময় কাটতে লাগল। সে এখন মুখুজ্যেকে কিছু বলে না। আর কোন বিষয়ে কোন উৎসাহ নেই, স্রোতে গা ভাসিয়ে অর্জুনদাস চলতে লাগল। স্রোতের টানে যেখানে গিয়ে লাগে লাগবে।

অর্জুনদাস অনেক ভেবে ঠিক করলে যে সে মুখুজ্যেকে পরে একবার শেষবারের মত জিজ্ঞেস করবে তার মনের মতলবটা কি? যা হয় হবে। অর্জ্জুনদাস আর কোন ভয় পাবে না। সে একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়বে।

অর্জুনদাস রোজই ভাবে আজ সে মুখুজ্যের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া

করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। কোথায় যেন আটকায়। তার মনের মধ্যে কে যেন তাকে সামনে যাবার পথে পথ আটকে দাড়িয়ে থাকে আর বলে অর্জুনদাস হঠকারিতা ভাল নয়। ঝগড়া করে এতবড় সম্পত্তি একেবারে হাতছাড়া করো না। অর্জুনদাস এগিয়ে গিয়েও আর পারে না। প্রতিবার বিফল চেষ্টার পর অর্জ্জুনদাস নিজেকে ধিক্কার দেয় আর ভগবানের কাছে জানায় আমায় শক্তি দাও প্রভু। আমি সাত্যিই বড় অধম। আমি তোমাকে কোন দিন ডাকিনি। আজ মহা বিপদে তুমি রক্ষা কর।

দিন আসে দিন যায়। সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। চিন্তায় চিন্তায় অর্জুনদাস মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়ল। মুখুজ্যে তাকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। যে মুখুজ্যে তার সামনে মাথা তুলে কথা বলত না আজ তার কি পরিবর্তন চিন্তা করলেও আশ্চর্য হতে হয়। তাদের ফার্মের কেস করবার জন্যে মুখুজ্যে সব সময় উমেদার হয়ে থাকত তাকে কত বিশ্বাসই না করা হয়েছে! সেই বিশ্বাসের ভাল প্রতিদান মুখুজ্যে দিয়েছে। এখন মুখুজ্যে তাকে দেখলে চিনতে পারে না এমন ভাব দেখায় যে তাকে আগে কখনও দেখে নি। কয়েক দিন পরে আজ অর্জুনদাসের মনে পড়ল তার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কথা অনেকদিন তাদের সঙ্গে দেখা হয় নি। তার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। সে অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। পায়চারী করতে করতে সে ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং উত্তেজনার মধ্যে ঠিক করল যে আর একমুহূর্তও সে দেরী করবে না। পরদিনই সে একবার মুখুজ্যের সঙ্গে শেষ বারের মত বোঝাপড়া করবে। আর এভাবে অপমানের সঙ্গে তাঁবেদারী করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে অনেব সহ্য করেছে আর সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পরদিন সকালে অর্জুনদাস সমস্ত মান অপমান ভুলে মুখুজ্যের কাছে তার অফিসে গিয়ে দেখা করল। মুখুজ্যে তাকে একবার বসতেও বলল না। দাঁড়ান অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করল—কি ছোটবাবু এত সকালে খবর কি?

মুখুজ্যের মুখে একসময় এই ছোটবাবু সম্বোধন কত ভালই না লাগত অর্জুনদাসের। কিন্তু আজ এই ছোটবাবু সম্বোধন তার কাছে এক শ্লেষ বলে মনে হল। অনেকদিন ধরে অনেক কথা অর্জুনদাসের মাথায় ছিল কিন্তু বলবার সময় সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেল। সে কিছুই মনে করতে পারল না।

মুখুজ্যে আবার বললে—ছোটবাবু দাড়িয়ে রইলে কেন, বস—কি খবর বল।

অর্জুনদাস আর কোন ভণিতা না করে এক নিশ্বাসে বলে ফেলল—মুখুজ্যে মশাই আপনি আমাদের অসময়ে যথেষ্ট উপকার করেছেন আর আপনিও উপকৃত কম হন কি। আজ দেড় বছরের ওপর আপনি আমাদের ব্যবসার সব কিছু ভোগ করছেন কই একবারও ত আমাদের অংশ দেবার কথা বলছেন না। আমি আজ আপনার কাছে জানতে চাইছি আপনি আমাদের যা পাওনা তা বুঝিয়ে দেবেন কিনা আর তা কবে বোঝাবেন ?

ওঃ এই কথা! বলে মুখুজ্যে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল—তাই বলি ছোটবাবু আজ এত সকালে কি মনে করে এসেছেন। এত খুব সত্যিকথা আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে উপকৃত। তবে একটা কথা ছোটবাবু ভুলবেন না। এ কোম্পানী এখন আপনাদের নয়। এতে আপনাদের কোন অংশ নেই। তাছাড়া আপনারা যখন কোম্পানী বিক্রী করেন তখন আপনারা বহুটাকা ঋণ রেখেছিলেন আর কোম্পানীর সুনাম বজায় রাখবার জন্যে আমাকে সেই সমস্ত ঋণ শোধ দিতে হয়েছে। তারপর সব শেষে আপনারা যে সমস্ত জালিয়াতী করেছেন তার বিরাট ঝুঁকি আমাকে নিতে হয়েছে। আপনি যে মাধবদাস এখন অর্জুনদাস সেজে এখানে আছেন এটা আমারই দয়ায়। আমি যে কোন সময়ে আপনাকে পুলিসের হাতে দিতে পারি। পরস্পরের উপকারের খতিয়ান নিলে আপনি দেখবেন যে আমি আপনাদের কাছে যে উপকার পেয়েছি তার চেয়ে শতগুণ উপকার আমি করেছি। তার প্রতিদান আমাকে আপনারা ভালভাবেই

দিয়েছেন। আপনাকে আমার এখানে রাখার কোন ইচ্ছাই ছিল না। আপনি নিজেই এখানে আছেন এবং বিনা পরিশ্রমে মাসে আড়াইশ টাকা পাচ্ছেন। এটা কি কিছুই নয়? আমি আপনাকে পরিস্কার বলে দিচ্ছি আপনারা আমার কাছে আর কিছুই পাবেন না। যদি প্রয়োজন বোধ করেন আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। আর এও জেনে রাখুন এই মাসের শেষে আপনি আর এই কোম্পানীতে কোন সংস্রব রাখতে পারবেন না। আমি আপনাকে লিখিত নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেব।

অর্জুনদাসের মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। সে কোনমতে "আচ্ছা" বলে ঝড়ের বেগে গিয়ে তার ঘরে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় সে চোখ বুজে শুয়ে আবোল তাবোল ভাবতে রইল। অসংলগ্ন চিন্তার মধ্যে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল তা তার মনে নেই। ঘুম থেকে উঠে দেখে যে তার ঘরে একটা টেলিগ্রাম। বেশ বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা খুলে পড়ল লেখা আছে—তোমার স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ, শীঘ্র চলে এস—কেশবদাস।

অর্জুনদাস হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে বেজেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে জামাকাপড় পড়ে নিল। হ্যাঁ ভালই হয়েছে একেবারেই সে বাড়ী যাবে। আর এখানে তার কি আছে থাকবার আকর্ষণ। তার চাকরীও শেষ হয়েছে কোনদিন আবার ঐ চামার মুখুজ্যে বলবে যে এখানে থাকা চলবে না। তার চেয়ে আগে থেকেই মানে মানে বিদায় নেওয়া ভাল। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল তার ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে অর্জুনদাস তার একাউণ্টস থেকে চল্লিশ হাজার টাকা তোলার ব্যবস্থা করল দুদিনের মধ্যে আর একটা দরখাস্ত করল যে বাকী টাকা তার রাজপুতানার ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার যেন করা হয়। এর জন্যে অর্জুনদাস আর একটা চিঠি পরে দেবে। সেখান থেকে অর্জুনদাস রেল অফিসে গেল তার টিকিটের ব্যবস্থা করবার জন্যে।

যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। সৈন্যবিভাগের অফিসারদের ঘন ঘন যাতায়াতের জন্যে অধিকাংশ ট্রেনের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী বহুদিন আগে থেকে রিজার্ভ করা থাকত। টিকিট পাওয়া একটা সমস্যার কথা। অর্জুনদাস অনেক চেষ্টা করে একটা ফার্স্টক্লাস আপার বার্থ-এর টিকিট পেল তিনদিন পরের গাড়ীতে তাও একটা এক্সপ্রেস ট্রেনে দিল্লী পর্য্যন্ত। দুটোরাত গাড়ীতে কাটাতে হবে কোন উপায় নেই। একবার ভাবল প্লেনে যাবার কথা কিন্তু সেখানে আরও অসুবিধে একসপ্তাহের বুকিং আগে থেকে হয়ে আছে। তাছাড়া রাজপুতানায় 'সাঙ্গানীর' বিমান বন্দর থেকে তাদের বাড়ী যেতে আরও একদিন লাগবে। অর্জুনদাস ফেরার পথে একটা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করে দিল যে তিনদিনপরে দিল্লী এক্সপ্রেসে সে রওনা হচ্ছে দিল্লী হয়ে। তারপর সে নিজের জায়গায় ফিরল। আজ তার মনে হল যেন সে অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। মাথায় বোঝার মত একটা ভার সবসময় তার যে অশান্তির সৃষ্টি করছিল সেটা আজ দূর হয়েছে। সে অজানতে ভগবানকে কাতরভাবে জানাল হে প্রভু আমি যেন নির্বিঘ্নে এই পাপের জায়গা থেকে চলে যেতে পারি। যেন আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আবার মিলতে পারি। আমার কেবল এইটাই তুমি দয়া কর।

(৪)

নির্দিস্ট দিনে অর্জুনদাস অতি সাধারণ বেশে একটা ধুতি সার্ট আর একটা লম্বা কোট গায়ে, পায়ে একজোড়া সস্তা দামের পাম্পসু পরে একটা ছোট সুটকেস নিয়ে দিল্লী এক্সপ্রেসের একটা-প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠল। কেউ জানতে পারল না যে এক সময়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কেশবদাস মাধবদাসের এক সময়কার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী অংশীদার আজ এই কামরায় অন্যনামে যাচ্ছেন। অর্জুন দাসের মনে পড়ল বেশীদিন আগে নয় বোধ হয় দু বছর হবে তখন ট্রেনে কোথাও যাবার সময় কত অসংখ্য লোক তাকে স্টেশনে ছাড়তে

আসত আর আজ সে অচেনা অজানার মত চুপে চুপে চলে যাচ্ছে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে। আবার কোন দিন সে এখানে আসতে পারবে কি না জানে না। হয়ত কেন নিশ্চয়ই আর তার আসা হবে না। সে যা কিছু স্টেশনে দেখছিল সবই তার ভাল লাগছিল। সে আগে অত ভাল করে দেখেনি কখন। ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখল একটা কাঠবিড়াল কেমন সুন্দর ভাবে মুখে করে একটা চিনাবাদাম নিয়ে একটা লোহার থাম বেয়ে ওপরে উঠে তার লেজ আর পেছনের দুটো পায়ের ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বসে সামনের দুটো পা দিয়ে চিনাবাদমটা ধরে মনের আনন্দে খাচ্ছে আর মাথা ঘুরিয়ে দেখছে চারিদিকে। কি চঞ্চল তার গতি। অর্জুনদাস সেই দিকে চেয়ে থাকে। কোথা থেকে একটা শালিক উড়ে এসে কাঠবিড়ালের কাছে বসল আর কাঠবিড়াল সেই বাদামটা মুখে নিয়ে টক্ টক্ আওয়াজ করতে করতে থামের আড়ালে গিয়ে লুকাল একেবারে থামের গায়ে মিশে গিয়ে। একদল কাঙ্গালীর ছেলেমেয়ে ফেলে দেওয়া ডাবের শাঁস খাবার জন্যে রেল লাইনের ওপর কাটা ডাবগুলো আছড়ে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে ফাটাবার জন্যে। একটা দেশী কুকুর তিন পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে রেল লাইনের ওপর খাবার খুজে বেড়াচ্ছে। সামনের ডান পাটা হাঁটুর তলা থেকে কোনদিন ট্রেনে কাটা পড়েছিল। এই সময় আর একটা কুকুর এসে পড়ায় খোঁড়া কুকুরটা তার পেছনের দুপায়ের মধ্যে লেজটা ঢুকিয়ে সেখান থেকে তিন পায়ে ছুটে পালাল। অর্জুনদাস তন্ময় হয়ে এই সব দেখছিল। হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গল ইঞ্জিনের 'কুউ-উ' শব্দে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলার ঝাঁকানিতে। আস্তে আস্তে প্ল্যাটফরম পার হয়ে গাড়ী ইয়ার্ডে পড়ল তারপর ধীরে ধীরে গাড়ীর গতি বাড়তে লাগল। অর্জুন দাস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে পা তুলে বসে রইল জানলা দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে।

ট্রেনে চলার সময় অনেক নতুন বন্ধু হয়। দূরের যাত্রীরা যে যে স্তরেরই হোন কেন, যে যে মতবাদেরই, হোক না কেন পরস্পর আপন করে নিতে বেশী দেরী লাগে না। এটা বেশী করে দেখা যায় নিম্ন

শ্রেণীতে। প্রথমে গাড়ীতে উঠতেই দিতে চায় না যারা গাড়ীর ভেতরে আছে। তারপর একবার গাড়ীতে কোন রকমে চড়তে পারলে যারা প্রথমে সব চেয়ে বেশী আপত্তি করেছিল তারাই সব চেয়ে বেশী আপন হয়ে ওঠে। উঁচু শ্রেণীতে এই বন্ধুত্ব একটু দেরীতে হয় তবে খুব বেশী দেরী হয় না কিছু দূর যেতে যেতেই হয় এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত। অর্জুন দাসেরও তাই হল। তার সহযাত্রীরা সবাই দিল্লীর পথে যাত্রা করেছে। কেউ দিল্লীতে যাবে আবার কেউ দিল্লী হয়ে আরও দূরে যাবে অর্জুন দাসের মত।

কথায় ও আলোচনায় প্রথম রাত্রি আর পরদিন বিকেল পর্যন্ত বেশ ভাল ভাবেই কাটল। আর একটা রাত আর বিকেল কাটালেই দিল্লী পৌছানো যাবে। রাতের খাওয়া সেবে অর্জুনদাস তার ওপরের বার্থে শুয়ে পড়ল। একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে বেশ ভাল ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙ্গল একটা বিরাট ঝাঁকুনিতে। অর্জুনদাস সেই ঝাঁকুনিতে ওপর থেকে নীচে পড়ে গেল। আঘাত তার বেশী লাগে নি কিন্তু দারুণ অন্ধকার কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। আন্দাজে সে দেয়ালের গায়ে সুইচ টিপল কিন্তু আলো জ্বলল না। আর একজন সহযাত্রী সেও গাড়ীর মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল; সে কেমন করে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালতে অর্জুনদাস দেখল তার সুটকেসটা যার ওপর সে মাথা রেখে শুয়েছিল দূরে পড়ে আছে। অর্জুনদাস সেটা উঠিয়ে তার বার্থের ওপর রাখল। তারপর কোমরে হাত দিয়ে দেখল যে টাকার বাণ্ডিলটা ঠিকই আছে। অন্য একজন সহযাত্রী একটা ছোট টর্চ জ্বালতে দেখা গেল একটা মাঠের মাঝখানে গাড়ীটা থেমেছে আর অনেক লোকের কান্না ও যন্ত্রণার কাতরানি কানে আসতে লাগল। অর্জুনদাস দরজা খোলার চেষ্টা করল কিন্তু দরজা যেন চাবিবন্ধ হয়ে আছে কিছুতেই খোলা গেল না। জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে যতটা দেখা যায় টর্চের আলোতে দেখল তাদের ট্রেনের কয়েকটা 'বগি' লাইনচ্যুত হয়েছে আর অনেক লোক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করছে।

অর্জুনদাস শুনেছিল যে ট্রেন দুর্ঘটনার পর রেল কোম্পানীর লোকেরা আহতদের ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেলে আর এই মাঠের মধ্যে অনেক ঠেঙ্গাড়ে আছে যারা এই সব সময়ে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা, পয়সা, কলম, পেন্সিল সব কিছু কেড়ে নেয়। অর্জুনদাস চিন্তিত হল। শেষকালে কি ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে প্রাণ যাবে? কামরার মধ্যে আর যারা আছেন তাদেরও অবস্থা সঙ্গীন। সবাই কি হল কি হল বলে চীৎকার করছে। অর্জুনদাস অনুমান করতে পারল না কোন যায়গায় ট্রেনটা এসেছে। সে তার কোমরে আর একবার হাত দিয়ে দেখল তার টাকার বাণ্ডিলটা ঠিক আছে। তার হাতের ঘড়িতে দেখল তখন রাত সাড়ে নটা মাত্র। সে হাতের স্যুটকেসটা নিয়ে জানলা দিয়ে গলে দরজার সামনে পাদানিতে পা দিয়ে নীচে নেমে পড়ল। নীচে নেমে তার মন আতঙ্কে ভরে গেল। চারিদিক অন্ধকার, অনেক লোকের যন্ত্রনা কাতর চিৎকার। কি করবে সে প্রথমটা ঠিক করতে পারল না। একবার ভাবল যে সে গাড়ীর মধ্যে উঠে বসুক কিন্তু এই জনমানবহীন মাঠের মাঝখানে কি হবে কে জানে। শেষে ঠিক করল সে গাড়ীর ইঞ্জিন যে দিকে আছে ঐ দিকে এগিয়ে যাবে। কাছেই কোন না কোন পল্লী পাবে সেইখানে রাতে থাকবে।

সে আর দ্বিরুক্তি না করে আগে চলতে লাগল। কিছুদূর চলার পর দেখতে পেল কিছুদূরে কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে। অর্জুনদাস সেই আলো লক্ষ্য করে চলল। আলোর কাছে এসে দেখল সেটা একটা ছোট মুদির দোকান। মুদি তখনও তার সারাদিনের হিসেব মেলাচ্ছে। তাকে ঐ সময়ে সেখানে দেখে মুদি একটু অবাক হয়ে গেল। ছোট জায়গা এখানকার প্রায় সকলকেই মুদি চেনে। অর্জুনদাস তাকে বললে—এখানে একটা ভীষণ ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে, অনেক লোক হতাহত হয়েছে। স্টেশন এখান থেকে কতদূরে বলতে পার?

মুদি বললে যে বাবলা স্টেশন আরও মাইল খানেক দূরে। অর্জুনদাস জায়গার নাম জিজ্ঞেস করতে মুদি বললে 'ভরনা'।

অর্জুনদাস আর দাঁড়াল না। এগিয়ে যেতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে লাইন ধরে সে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে খোয়ায় হোচট্ খায় আবার সামলে নিয়ে চলতে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা পরে সে একটা ছোট স্টেশন দেখতে পেল। স্টেশনের অফিস ঘরের কাছে দুটো কেরোসিনের আলো জ্বলছে। প্ল্যাটফরমের ঢালু অংশ দিয়ে ওপরে উঠে অর্জুনদাস স্টেশন মাষ্টারের ঘরের কাছে গিয়ে দেখল রেলের কোট গায়ে একজন লোক ঝিমচ্ছে। অর্জুনদাসের ডাকে সেই লোকটি চমকে উঠল। অর্জুনদাস তাকে রেল দুর্ঘটনার কথা বলল। লোকটি একজন এ. এস. এম। সে বললে তাই গাড়ী এখনও আসে নি। সেও ভাবছে কেন আসছে না। তখনি হাতের কাছে টেবিলের ওপর রাখা টেলিগ্রাফের যন্ত্রটি নিয়ে "টরে টক্কা" "টরে টক্কা"করে কি খানিকক্ষণ করে অর্জুনদাসকে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি ঐ ট্রেনে আসছিলেন ?

"জী হাঁ৷ আমি ঐ ট্রেনেই আসিয়াছিলাম। গাড়ীত বোধহয় ঠিক হতে অনেক সময় নেবে আমার বেশ জরুরী দরকার দিল্লী যাবার কি করা যায় তাই আপনার পরামর্শ চাই।"

—আপনি যে রকম বলছেন তাতে মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি হবে না। কাল সকালে আপনি এখান থেকে বাস পাবেন কানপুরের। সেখান থেকে দিল্লীর গাড়ী পাবেন। আজ রাতটা ত আপনাকে কোন জায়গায় কাটাতে হবে।

—এখানে কোন থাকার জায়গা ভাল আছে ?

—আজ্ঞে আর একটু আগে গেলে একটা ছোট হোটেল আছে। এখন খোলা আছে কিনা জানি না আপনি একবার দেখতে পারেন।

অর্জুনদাস আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে স্টেশনের প্রায় গায়েই একটা ছোট বাড়ীর মত দেখে অনুমানে বুঝল সেইটাই বোধ হয় হোটেল। সেখানে গিয়ে দেখল যে দুটো পাশাপাশি দোকান ঘরের মত। কোন দরজা নেই দেহাতী লোকেরা এখানে আসে আর কাজ কর্মে দেরী হলে এখানে রাত কাটায়। অর্জুনদাসের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়।

একজন লোক জেগে বসে বিড়ি টানছিল। অর্জুনদাসকে দেখে বললে—কি চাই ?

অর্জুনদাস তাকে জিজ্ঞেস করলে—এখানে আলাদা থাকার কোন ঘর আছে আজ রাতটার জন্যে ?

—আলাদা ঘর ? না সাহেব এখানে কোন ঘর নেই।

—কাছাকাছি কোথাও আছে জান ?

লোকটি অর্জুনদাসকে কোন হোমরা-চোমরা কিছু মনে করে বললে—ঐ বাম দিকে একটা পুলিশ চৌকি আছে আপনি ঐখানে দেখতে পারেন ওখানে আপনার থাকার ব্যবস্থা হতে পারে।

অর্জুনদাস যেন হাতে স্বর্গ পেল। সে লোকটাকে শুক্রিয়া জানিয়ে সেই পুলিশ চৌকির দিকে চলতে লাগল। লোকটির দেখান মত মিনিট পাঁচেক যেতেই রাস্তার ওপর একটা বড় চারচালা ঘর, সামনে অনেকটা খোলা জায়গা দেখতে পেল। সব জায়গাটাও কাঁটা তারে ঘেরা আছে। গেটের কাছে একজন সিপাহী দাড়িয়ে আছে। সেই সিপাহী যেখানে দাড়িয়ে আছে তার পাশেই একটা কাঠের খুঁটির ওপর একটা কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে আর সেই লণ্ঠনের কাচের গায়ে লেখা আছে লাল অক্ষরে "বাবনা ফাঁড়ি।"

অর্জুনদাস গেটের কাছে পোঁছতেই সেই সিপাহীটি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত লাফিয়ে উঠল—"হুকুমদার ?"

অর্জুনদাস এর আগেও অনেক জায়গায় এ রকম দেখেছে। সে হাততুলে বলল দোস্ত। অন্দর কোই হ্যায় ?"

সিপাহীটি এগিয়ে এসে তাকে ভাল করে দেখে বললে—পাস্ দোস্ত। হাবিলদার সাব হ্যায়।

অর্জুনদাস সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা ঘরে একটু বড় আলো জ্বলছে। সে সামনে ঢুকে দেখল যে একজন হাবিলদার টেবিলের সামনে বসে খাতায় কি লিখছে। অর্জুনদাস তার সামনে বলল সেলাম হাবিলদার সাহেব।

খাতা থেকে মাথা না তুলেই হাবিলদার সাহেব তার বাজখাই গলায়

জিজ্ঞেস করল কৌন্ ?

অর্জুনদাস পরিষ্কার হিন্দীতে বললে আমি হাবিলদার সাহেব। আমার নাম অর্জুনদাস।

মাথা তুলে সে দিকে চেয়ে হাবিলদার সাহেব জিজ্ঞেস করল কি আছে বলুন। বসুন।

অর্জুনদাস সামনের একটা হাতল ভাঙ্গা চেয়ারে বসে বললে সাহেব আমি দিল্লী এক্সপ্রেসে আসছিলাম। এই বাবনা স্টেশনের আরও মাইল খানেক আগে একটা বড় এক্সিডেণ্ট হয়েছে অনেক লোক মারা গেছে। আমাকে আপনি আজকের রাতটা থাকার একটা নিরাপদ জায়গা করে দিন।

—এখানেত থাকার কোন ব্যবস্থা নেই, আপনি কাছেই বেশ লাইনের ধারে একটা হোটেল আছে ঐখানে যান আজ রাতে শোবার কোন অসুবিধে হবে না। আমি লোক দিয়ে আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—না হাবিলদার সাহেব। আমি ও জায়গা দেখেছি ওটা বেশ নিরাপদ নয়। আমি আর একটু নিরাপদ জায়গা চাইছি। একটু বিশেষ কারণ আছে।

—কি কারণ আমি জানতে পারি কি ?

একটু ইতস্ততঃ করে অর্জুনদাস বললে—আমার কাছে কিছু টাকা আছে।

হাবিলদার জিজ্ঞেস করলে—কত টাকা ?

অর্জুনদাস হাবিলদারকে তার অবস্থা বোঝাবার জন্যেই বললে—আমার কাছে চল্লিশ হাজার টাকা আছে।

"অ্যাঁ বলেন কি ? চল্লিশ হাজার ?" বলে হাবিলদার বিস্ফারিত চোখে অর্জুনদাসের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

অর্জুনদাস বড়বাবুর সেই চাহনীর মধ্যে দেখতে পেল একটা লালসার ইঙ্গিত। সে হাবিলদারের সেই বুভুক্ষিত দৃষ্টির মধ্যে অশুভের সঙ্কেত দেখতে পেল। সে সেই দৃষ্টির দিকে আর চেয়ে থাকতে পারল

না। চোখ নামিয়ে নিল আর ভাবতে লাগল কেন সে বলতে গেল তার কাছে অত টাকা আছে! কি দরকার ছিল তার বলবার?

হাবিলদার কয়েক সেকেণ্ড পরে নিজেক সংযত করে বললে—তাইত আপনার কাছে এত টাকা আছে। যেখানে সেখানেত থাকা ঠিক হবে না। কি করা যায়। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসতে বললে—আচ্ছা একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমাদের ফাঁড়ির ব্যারাকে জায়গা হতে পারে। সব সিপাহীরা রাত্রে থাকে না। যারা দূরে ডিউটিতে গেছে তারা কাল সকালের আগে ফিরবে না। এই রকম একটা খাটিয়াতে আপনার ব্যবস্থা করে দেব। তাতে আপনার চলবে?

অর্জুনদাস আর কোন কথা না বলে বললে—হ্যাঁ তাতেই চলবে। উপস্থিতের মত এই ব্যবস্থায় তার মনে অনেক শান্তি এল। পল্লীগ্রাম জায়গা সেত দেখেই এল এখানকার হোটেলের ছিরি! আরও খুঁজলে হয়ত দু একটা পবিত্র হিন্দু হোটেল পাওয়া যাবে। সেখানকার অবস্থাও ঐ রকমই। কোন ঘরের হয়ত দরজা নেই কোন জানালার গরাদ হয়ত নড় বড় করছে। আর তা ছাড়া সেখানে এত রাত্রে একখানা আলাদা ঘর পাওয়াও অসম্ভব। যদিও পায় সকলেরই লক্ষ্য পড়ে যাবে তার ওপর। তার চেয়েও এখানে এই সিপাহীদের মধ্যে ব্যারাকে থাকা অনেক নিরাপদ হবে। কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে ভোর বেলা চলে যাবে। সে হাবিলদারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে তাকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করল। অর্জুনদাস বড় ক্লান্ত অনুভব করছিল।

হাবিলদার একটা ছোট টর্চ হাতে নিয়ে অর্জুনদাসকে নিয়ে তার নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে একটা খাটিয়া দেখিয়ে বলল—আপনি আজ রাত্রে এইখানে থাকুন। আপনার আশে পাশে আরও ৮।১০ জন সিপাহী থাকবে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। দরজায় পাহারা আছে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারবেন।

অর্জুনদাস দেখল যে আরও কয়েকটি খাটিয়া খালি আছে। সে হাবিলদারকে জিজ্ঞেস করতে জানতে পারল যে সবকটা খালি

খাটিয়া একেবারে খালি থাকবে না। কারণ অনেকে মাঝ রাত্রে ডিউটি থেকে ফিরবে কিন্তু যে খাটিয়াতে অর্জুনদাসকে শুতে দিয়েছে সেটা শেষ পর্যন্ত খালি থাকবে কারণ যে সিপাহী ঐ খাটিয়াতে শোয় সে পরদিন সকালের আগে ফিরতে পারবে না।

অর্জুনদাস তার খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল। হাবিলদারও তার অফিসে চলে গেল।

অর্জুনদাস কখনও এইরকম ভাবে থাকে নি। প্রথমে তার একটু ভাল লাগলেও এইরকম পরিবেশ তার একেবারে ভাল লাগল না। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। সেটাকে আরও থমথমে করে তুলেছে ঘুমন্ত সিপাহীদের নাক ডাকার শব্দে। সে একবার তার কোমরে হাত দিয়ে দেখল তার টাকার বাণ্ডিলটা ঠিক আছে। সে কেবল ভাবতে লাগল যে টাকার কথাটা হাবিলদারকে বলাটা ঠিক হয় নি। যে ভাবে হাবিলদার তার মুখের দিকে চল্লিশ হাজার বলে তাকিয়ে ছিল লোলুপ দৃষ্টিতে তাতে তার ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিল। পরক্ষণে সে তার মনকে প্রবোধ দিল যে সে বলে ভালই করেছে। হাবিলদার নিশ্চয়ই তার ভালভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করবে। হাবিলদারকে সন্দেহ করা মানে তার মনের ভুল। এরকম সন্দেহ করা তার উচিত নয়। এদের ওপর সকলের ধন, প্রাণ সব কিছুই নির্ভর করছে। এরকম আবোল তাবোল ভাবা তার কোন মতেই উচিত নয়। এইবার সে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘুমের জন্যে চেষ্টা করলে কি হবে, অর্জুনদাস একেবারে ঘুমতে পারছে না। তার স্যুটকেসটা মাথায় কাছে রেখে সোজা হয়ে শুয়ে রইল কিন্তু কিছুতেই ঘুমতে পারল না। রাজ্যের দুশ্চিন্তা তার মাথায় একটার পর একটা আসতে আর যেতে লাগল। একবার তার মনে হল তার স্ত্রীর কথা, তার স্ত্রীর অসুখের কথা। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল মুখুজ্যের কথা। কি বিশ্বাসঘাতক লোক এই মুখুজ্যে। তাদের কাছে মুখুজ্যে কম উপকার পায় নি। বহুটাকা তারা দিয়েছে মুখুজ্যে একি নীচ ব্যবহার করল তাদের সঙ্গে! এই কয় বছর আগে

মুখুজ্যে কি ছিল? কে তাকে চিনত? কোর্টে যেত আর আসত। বট্‌তলায় বসে বসে বিড়ি ফুঁকত। আর আজ একটা কোলিয়ারী, বড় বড় দুটো বাড়ী সমস্তই যেন ছোট ছেলের হাতের মোয়ার মত কেড়ে নিয়েছে। যদি কোনদিন সে একবার সুযোগ পায় তাহলে এই মুখুজ্যেকে একবার দেখবে।

ভাবতে ভাবতে তার চোখে আর ঘুম আসতে চায় না। সে কখন এপাশ ফিরে শোয় আবার কখন অন্যপাশ ফিরে শোয়। যারা এই পরিবেশের মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে অর্জুনদাস তাদের তারিফ্ করতে লাগল। সে ভাবতে লাগল যে অভ্যাসে সবই সম্ভব হয়। সেওত কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে কলকাতার বাইরের বাড়ীর একখানা ঘরে তাকে কোনদিন একলা দিনের পর দিন থাকতে হবে। অন্ততঃ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এ-সেই মাধবদাস যে ফার্স্টক্লাস হোটেল ছাড়া কোনদিন বাইরে রাত কাটায়নি আর আজ সে এ কোথায় শুয়েছে? আবার হয়ত গাছতলাতেও তার কোন অসুবিধে হবে না। সে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। হাতের ঘড়িটা সে স্যুটকেসের মধ্যে রেখেছিল। থানার পেটা ঘড়িতে বারটা বাজল। থানাটা ব্যারাক থেকে একটু তফাতে যদিও একই কমপাউণ্ডে। মাঝে কেবল একটা বড় মাঠ। এইখানে বোধহয় সকালে সিপাহীদের প্যারেড হয়।

কানখাড়া করে অর্জুনদাস শুনতে লাগল একটা খট্ খট্ করে শব্দ থানার দিক থেকে ক্রমে ক্রমে ব্যারাকের দিকে আসছে। শব্দটা ভারী বুটের শব্দ। এই খট্ খট্ শব্দ যত কাছে আস্‌তে লাগল ততই যেন আস্তে আস্তে হতে লাগল। সাধারণতঃ বুটপায়ে দিয়ে হাঁটলে চলার শব্দ একটা ছন্দের মত কাণে আসে কিন্তু এ শব্দটা সেরকম নয়। যেন কেউ না টিপে টিপে আসছে। সেই নির্জন রাতে সামান্য একটা শব্দও কাণে আসে। হঠাৎ সেই চাপা শব্দটা থেমে গেল আর অর্জুনদাস ব্যারাকের দরজার কাছে একটা নীচুগলায় কথা বলার আওয়াজ শুনতে পেল। সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তিকে একত্র করে সে তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলল। সে পরিষ্কার শুনতে

পেল হাবিলদারের গলা। হাবিলদার বলছে—হ্যাঁ পাঁচনম্বর খাটিয়ায়। যে লোকটির সঙ্গে হাবিলদার কথা বলছে সে জিজ্ঞেস করলে—কত মাল হবে ? উত্তরে হাবিলদার বললে—চল্লিশ হাজার।

অর্জুনদাস পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে যে সেই অপর ব্যক্তি বলছে—আচ্ছা ঘুমটা একটু পাকা হোক আর রাত দুটোয় ডিউটিওলারা চলে যাক তারপর আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে ঠিক করা যাবে।

হাবিলদার বললেন—"আমি তোমাকে খাটিয়াটা দেখাচ্ছি। এখান থেকে দেখ" বলে দরজার কাছ থেকে টর্চের আলো ফেলল হাবিলদার। টর্চের আলো ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং খাটিয়া পার হয়ে এসে দাঁড়াল ৫নং খাটিয়ার ওপর। আলোটা ধীরে ধীরে তার মুখের ওপর এসে পড়ল। তার মাথায় পাশেই আছে স্যুটকেসটা। সে স্থির হয়ে শুয়ে আছে। তার কাণে এল অপর লোকটি বলছে—ঐ স্যুটকেসওয়ালা ত ?

হাবিলদার সেই একই ভাবে চাপা গলায় জবাব দিল—হ্যাঁ ঐ লোকটিই।

তখন অপর লোকটি বললে—আচ্ছা আমি কাল্লুকে খবর দিচ্ছি তবে আমার হিস্যাটা…আর বাকি কথা অর্জুনদাস শুনতে পেলনা। হাবিলদার ও অপরজন আস্তে আস্তে ফিবে যেতে যেতে কথা বলতে লাগল। অর্জুনদাস অনেক চেষ্টা করেও আর শুনতে পেল না।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেছে। এখন কেবল ঘুমন্ত সিপাহীদের জোরে জোরে নিশ্বাস নেবার শব্দ একটানা হয়েই চলেছে। অর্জুনদাস ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। এর চেয়েও তার ট্রেন ভাল ছিল। ট্রেন ছেড়ে আসবার দুর্বুদ্ধি তার কেন হল। কেন সে হাবিলদারকে বলতে গেল যে তার কাছে এত টাকা আছে ? আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মৃত্যু অবধারিত। সে এখন কি করবে। উত্তেজনায় তার সারা দেহে ঘাম হতে লাগল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার রুগ্না স্ত্রীর মুখ। তার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে। আর কেশবদাস ? তার কোন খোঁজ না পেয়ে ভাববে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে ঠিক করা যাবে মানে তাকে মেরে ফেলবে। ওঃ

বাবা ভাবতেও যে প্রাণ আঁৎকে ওঠে। আজই তার সব শেষ। অচেনা, অজানা জায়গায় আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে আজই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে। সকলেই ত মরবে একদিন তবে মৃত্যুর দিন ক্ষণ জানা থাকলে বোধ হয় এই রকম অস্বস্তি হয়ে থাকে ফাঁসীর আসামীর মত। সে একবার আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকতে লাগল হে প্রভু আমি তোমাকে কোনদিন এমন ভাবে অনুভব করিনি আজ যেমন করছি। আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচবার রাস্তা দেখাও।

অনেকক্ষণ ডাকবার পর তার মনে যেন সে একটু জোর পেল। সে ভাবতে লাগল—কেন সে এমন ভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে? সে পুরুষ মানুষ। বাঁচবার সমস্ত রাস্তা সে খুঁজে বের করবে। রাস্তা তাকে বের করতেই হবে। সে স্থির হয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগল কি করা যায়।

উত্তেজনার মধ্যে সময় কি ভাবে কেটে যায় বোঝা যায় না। ফাঁড়ির পেটা ঘড়িতে একটা বাজল। অর্জুনদাস অস্থির হয়ে উঠল। হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা আসতেই সে উঠে বসল। তার স্যুটকেসের ভেতর থেকে ঘড়িটা হাতে বেঁধে নিল। তারপর স্যুটকেসটা ঠিক সেই ভাবে রেখে দিয়ে খাটিয়া থেকে নীচে নামল। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে একবার কোমরের বাণ্ডিলটা ঠিক করে দেখে আস্তে আস্তে ব্যারাকের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

অর্জুনদাস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পনের কুড়ি মিনিট পরে ব্যারাকের ঘরে একজন লোক ঢুকল। সে সোজা গিয়ে অর্জুনদাস যে খাটিয়াতে শুয়েছিল তাতেই শুয়ে পড়ল আর অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে মনে হল সে বড় ক্লান্ত।

রাত দুটোয় যাদের ডিউটি তারা সবাই বেরিয়ে গেছে। সমস্ত ব্যারাক নিস্তব্ধ। কেবল ঘুমন্ত সিপাহীদের নিশ্বাসের একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিরাম ডাক। কখনও কোথায় মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর ডানার শব্দ। প্রহরের শিয়ালের ডাক

শোনা গেল। কয়েকটা শিয়াল এক সঙ্গে ডেকে প্রহর ঘোষণা করল।

পৌনে তিনটের সময় চারজন লোক অতি সন্তর্পণে ফাঁড়ির ব্যারাকে এসে উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে হাবিলদার। বাকী তিনজনের চেহারা অতি ভীষণ প্রকৃতির। তাদের প্রত্যেকের দুই হাতে চামড়ার ব্যাণ্ড। গায়ে ফতুয়ার মত পরা আর পরণে হ্যাফপ্যাণ্ট। এদের একজনের কপালে একটা বেশ লম্বা কাটা দাগ আর একজনের নাকের ওপর থেকে গালের মাঝামাঝি একটা বিরাট ক্ষত সবে মাত্র সেরেছে। এখনও ঘা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় নি। সমস্ত মুখটা একটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এদের সকলেরই ওপর হাতে উল্কি করে ছোরা আঁকা আছে। এদের চেহারা দেখলেই মনে হয় যে এমন কোন নৃশংস ও জঘন্য কাজ নেই যা এরা করতে পারে না।

দরজার কাছে এসে হাবিলদার তার টর্চের আলো ফেলল। ব্যারাকের চার দিক দেখে নিয়ে খাটিয়ার ওপর টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ধরল। এক নং, দু নং, তিন নং, চার নং পার হয়ে পাঁচ নম্বরের ওপর গিয়ে স্থির হয়ে রইল। পাঁচ নং খাটিয়ায় একজন লোক দরজার বিপরীত দিকে মুখ করে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে সেই স্যুটকেসটা সেই ভাবেই আছে।

তিনজন লোক সেই খাটিয়ার কাছে যেতে হাবিলদার টর্চটা নিভিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল।

তিনজনের মধ্যে দুজন খাটিয়ায় শোয়া লোকটার মাথার কাছে দাঁড়াল আর তৃতীয় জন তার পায়ের কাছে দাঁড়াল। সেই সময়ে মাথার কাছে যে দুজন দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন তার হাফ-প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা মোটা সিল্কের দড়ির ফাঁস বার করে ঘুমন্ত লোকটার মাথা দিয়ে গলিয়ে আস্তে আস্তে গলার কাছে নিয়ে জোরে টেনে ধরল। মাথার কাছে অন্যজন তার হাত দুটো আর পায়ের কাছের লোকটি পা দুটো জোরে চেপে রইল। কয়েকবার বাঁচবার জন্যে বৃথা চেষ্টা করে ঘুমন্ত লোকটা স্থির হয়ে গেল তার চোখ দুটো ঠেলে যেন বেরিয়ে আসতে লাগল।

হাবিলদার আস্তে আস্তে খাটিয়ার কাছে এসে আলো জ্বালিয়েই আঁৎকে উঠল। একি! এ যে তার ভাই সিপাহী রামদেও। সে এখানে কি করে এল? সেত ডিউটীতে গেছে অনেক দূরে। সকালের আগে ত তার ফেরার কথা নয়। তবে কি সে ডিউটি ফাঁকি দিয়েছে? তবে সে লোকটা গেল কোথায়? তার স্যুটকেস রয়েছে, জুতো রয়েছে? এক টানে সে স্যুটকেস খুলে ফেলল। তার মধ্যে আছে ভাজকরা একটা তোয়ালে আর একটা "কল্যাণ" মাসিক পত্রিকা।

হাবিলদার স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইল। তার দুচোখ বেয়ে বর্ষার ধারার মত জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সঙ্গের গুণ্ডারা তাদের কাজ হাঁসিল করে সরে পড়েছে। হাবিলদার জোরে কাঁদতেও পারে না। ভায়ের গলা থেকে ফাঁসটা খুলে নিজের পকেটে রাখল তারপর ব্যারাক থেকে বেরিয়ে তার অফিসের দিকে গেল।

অর্জুনদাস অন্ধকারে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে কিছু ঠিক করতে পারল না। অচেনা জায়গা তার ওপর অন্ধকার। সে মস্ত সমস্যায় পড়ল। প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার আশঙ্কা। উত্তেজনায় তার মনে হল সে বোধ হয় এত শক্তি পেয়েছে যাতে সে যে কোন কঠিন কাজ করতে পারে। সামনে একটা ফাঁকা মাঠ আর তার পাশে একটা বড় শিশু গাছ দেখতে পেল। আর কোন দিকে না দেখে সে সেই গাছের ওপর উঠে ঘন পাতার আড়ালে একটা ভালমত ডালের ওপর বসে রইল। তার ইচ্ছে যে সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে।

খোলা মাঠের মশা তাকে ঘিরে ফেলল। দারুন মশার কামড়ে সে অস্থির হয়েও নিরুপায় হয়ে বসে রইল। কোন উপায় নেই। যেমন করে হোক তাকে বাকী রাতটা এখানে কাটাতেই হবে। যে ভয়ে সে প্রথম শ্রেণীর আরামদায়ক গাদি ছেড়ে চলে এসেছে সেই ভয়ই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সে তার হাতের রেডিয়ম ঘড়িতে দেখল সোয়া তিনটে বেজেছে।

কিন্তু একি! ফাড়ির দিক থেকে কতকগুলো লোক একটা বড়

আলো নিয়ে এই দিকেই আসছে। তবে কি তারা ওকেই খুঁজতে বেরিয়েছে? অর্জুনদাস ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। মাঝে মাঝে টর্চের আলো এসে পড়ছে। অর্জুনদাস একেবারে ভয়ে পাথরের মত হয়ে বসে রইল আর পাতার ফাঁকে চোখ দিয়ে দেখতে রইল।

কিছু সময়ের মধ্যে চার পাঁচ জনে মিলে একটা মড়া নিয়ে আসছে দেখতে পেল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছে হাবিলদার। তার হাতে একটা টর্চ। আর একজন লোক সঙ্গে আসছে একটা হ্যারিকেন আলো নিয়ে। ক্রমে ক্রমে সকলে খোলা মাঠের ওপর এসে দাড়াল। তারপর হাবিলদারের কথামত বড় গাছটার কাছেই একটা জায়গায় মড়াটা নামাল। হাবিলদার বাদে আর সকলেই একটা পাঁচফুট আন্দাজ লম্বা আর তিনফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সেই মড়াটা শোয়াল আর অর্জুনদাসের ফেলে আসা স্যুটকেস আর পাম্পসু জোড়া সেই গর্তের মধ্যে রেখে দিল। অর্জুনদাস বুঝতে পারল না ব্যাপার কি। কার লাশই বা কবর দেওয়া হল আর অর্জুনদাসের স্যুটকেস আর জুতো সেই কবরে কেন রাখা হল?

হাবিলদার মিনিট দুই সেই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে রইল তারপর চোখ মুছে ইসারা করতে সবাই মিলে মাটিচাপা দিয়ে দিল। কাছেই একটা ছোট ঝোপ মত ছিল সেখান থেকে কিছু শুকনো ডালপালা, লতাপাতা এনে কবরের ওপর চাপা দিয়ে দিল। হঠাৎ দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে ওখানে কবর আছে।

সমস্ত কাজ শেষ হবার পর হাবিলদার সকলকে উদ্দেশ করে বললে —ওঃ আমাদের খুব ঠকিয়েছে আজ। জীবনে এরকম বেকুব কখনই হইনি। কিন্তু সে যাবে কোথায়? সে যেখানেই থাক তাকে খুঁজে বার করবই। এতবড় ক্ষতি করে অক্ষতদেহে তাকে যেতে দেব না। এই ভাবে খানিকক্ষণ আস্ফালন করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে হাবিলদার ফাঁড়ির পথে ফিরে গেল।

অর্জুনদাস কিছুই বুঝতে পারল না। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল যতদূর আলোর ক্ষীণ রেখাটা দেখা যায়।

তার ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজেছে। পূব আকাশে অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। অর্জুনদাস ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এল। কোমরের বাণ্ডিলটা ঠিকমত দেখে নিয়ে ফাঁড়ির উল্টো দিকে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। তার সব সময়ে মনের মধ্যে আতঙ্ক কখন হাবিলদার তাকে ধরে ফেলে।

চলতে চলতে অর্জুনদাস রেল লাইনে এসে পৌছাল। লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানল যে গতরাতের ট্রেন তখনও ঠিক হয়নি তবে কাজ চলছে।

অর্জুনদাস আর কোন কথা না বলে লাইন ধরে চলতে লাগল। তারপর ঘণ্টা খানেক পরে দেখা গেল, যে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে সে নেমে গিয়েছিল তাতেই সে বসে আছে।

প্রকৃতির সাজা

অনেকদিন পরে একদিন বিকেলে একটু সময় পেয়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেছি। আগে প্রায়ই আসতুম কিন্তু আজকাল নানা রকম কাজের চাপে আর আসা হয়ে ওঠে না। শরত কাল, আকাশ পরিচ্ছন্ন। গড়ের মাঠের ধারে ধারে সব গাছ ফুলে ভর্তি। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া এবং অন্যান্য অনেক গাছ ফুলে ফুলে ভর্তি হয়ে আছে। সব চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে কতকগুলো বড় গাছে হলুদ রংএর ফুলের মেলা। গাছের ওপরে একেবারে ফুলের হাট বসেছে। তেমনি আবার গাছের তলায় ঝরা ফুলের কার্পেট বিছান আছে। দূর থেকে বড় সুন্দর দেখায়। দূর থেকে মনে হয় সমস্ত জায়গাটা হলদে রংএর আলপনা দেওয়া আছে। রাস্তার ওপরই ফুল পড়ে আছে। ঐখান দিয়েই আমার যাবার পথ। কাছে যখন পৌঁছলুম তখন ঐ ফুলগুলো মাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে হল না। পাশ কাটিয়ে একটু মাঠের ভেতর দিয়ে চলতে লাগলুম। আমার আর অন্য কিছুই ভাবনা ছিল না কেবল সেই সুদূর বিস্তীর্ণ হলুদ ফুলের শোভা দেখছিলুম।

গঙ্গায় ভরা জোয়ার। জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর পাড়ের কাছে যে সমস্ত নৌকা ছিল সে গুলো সব উঁচু হয়ে উঠেছে। নদীর পূব পাশের রাস্তা থেকে নৌকার ছই গুলো ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছে। পাড় থেকে লম্বা তক্তা তিন চার খানা পাশাপাশি ফেলে তার ওপর দিয়ে মজুররা মাল খালাস ও বোঝাই করছে। কাছেই একটা মালবাহী জাহাজে তার লম্বা কপিকল দিয়ে গঙ্গার ওপর ছোট নৌকা থেকে মাল তুলে জাহাজের খোলের মধ্যে রাখছে। ডেকের ওপর ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। যে মাল ওঠানর তদারক করছে সে মাঝে মাঝে চিৎকার করছে—'আড়িয়া, আড়িয়া।' ঘরঘর শব্দ করে কপিকলের তার চেন আল্‌গা করে দিচ্ছে আবার যখন চিৎকার করছে—'হাবিস' তখন ঘরঘর করে কপিকলের টানে মাল উঁচুতে উঠছে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এই আড়িয়া আর হাবিসের নামা ওটা দেখতে লাগলুম। এই সময়

দেখলুম গঙ্গার বুকে দূরে ভোঁ বাজিয়ে একটা লঞ্চ তীর বেগে ছুটছে স্রোতের অনুকূলে। লঞ্চের ঢেউতে ছোট ছোট নৌকাগুলো উঁচু নীচু হতে লাগল। এখনও গঙ্গার পাড়ে লোকের ভীড় হয় নি।

ওয়াটার গেটের কাছে এসে আমি একবার দাঁড়ালুম; এখানে দেখলুম পরপর কতকগুলো তাঁবু আছে গঙ্গার ধারে আব সেখানে কিছু বেদে বলে যাদের আমরা সাধারণ ভাবে বলে থাকি সেই রকম একদল এসে আস্তানা গেড়েছে আর তারা সঙ্গে এনেছে নানা জাতীয় কুকুর। এই কুকুর তারা বিক্রী করে। এর মধ্যে অ্যালশেশিয়ান কুকুরই বেশী। এদের বেশ ভূষা দেখে আমার মনে হল তারা রাজস্থানী। আমি তাদের একজন মাতব্বর গোছের বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে জানলুম যে তারা রাজস্থানের ব্রাহ্মণ। তাদের পূর্বপুরুষের একজন কুকুরের ব্যবসা করার জন্যে ঘর ছেড়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়ায়। তখন থেকেই তাদের এই দলের সৃষ্টি।

এইবার আমি রাস্তা পার হয়ে ফোর্টের ধার দিয়ে চলতে লাগলুম। আপন মনে চলেছি। কে আমাব নাম ধরে পেছন থেকে ডাকতে রইল—'অরিজিত, অরিজিত,'। আমি পেছন ফিবে দাড়াতে দেখি যে ভদ্রলোক আমাকে ডাকছিলেন তিনি আমার কাছে এসে গেছেন। আমি তাঁকে ঠিক চিনতে পারিনি। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি বললেন—কিরে আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি সুশান্ত। আমি তখনও ভাল করে চিনতে পারি নি। তখন তিনি বললেন—আরে কি আশ্চর্য একেবারে মাথা থেকে সাফ করে ফেলেছিস। তুই জুবলি স্কুলের অরিজিত না?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম—হ্যাঁ আমি জুবিলি স্কুলে পড়তুম এবং আমার নাম অরিজিত ঠিকই কিন্তু আমি তোমাকে চিনতে পারছি না। তখন তিনি বললেন—তা চিনবে কি করে? আমি ত আর তোমার মত ফার্স্ট বেঞ্চে বসতুম না। কিন্তু কি আশ্চর্য আমাকে একেবারে চিনতে পাচ্ছিস না! তখন আমার পুরাণ স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যে একে একে আমাদের ক্লাশের সব ছেলেদের নাম করতে লাগল—রবীন,

অজয়, কালী, হরিদাস ও আরও অনেকের। যাদের নাম সে করছিল তাদের আমি আজও মনে রেখেছি। এদের অনেকের সঙ্গে আমার স্কুল ছাড়ার পরও বহুবার দেখা হয়েছে। কিন্তু সুশান্তকে আমি একেবারে মনে করতে পারলুম না। আমি না পারলেও সে ছাড়বার পাত্র নয়। যখন তার সকল চেষ্টাই বিফল হল তখন সে বলল—আচ্ছা মথুরা পণ্ডিতের কথা তোর মনে আছে।

আমি বললুম—তা আর মনে নেই ?

—তাহলে এ-ও মনে আছে যে তাঁর ক্লাশে আমরা ভীষণ গোলমাল করতুম।

—হ্যাঁ।

—হেড পণ্ডিত পড়াতে পড়াতে ক্লাসে ঘুমাতেন আর ঘুমের মধ্যে হাঁ করে থাকতেন মনে আছে ?

—হ্যাঁ মনে পড়ে।

—একদিন তাঁর হাঁ করে ঘুমাবার সময় আমি তাঁর মুখে একটা কাগজ পাকিয়ে ফেলে দি আর তিনি ঘুম থেকে উঠে আমাকে এমন মেরেছিলেন যে আমি গায়ের ব্যথায় তিনদিন স্কুলে যেতে পারিনি।

আমার এইবার মনে পড়ল সেই দুষ্টু ছেলেটাকে যে ক্লাশের মধ্যে ছিল সবচেয়ে ডানপিটে আর দুঃসাহসী। তার মাথায় নিত্য নুতন বদমায়সী গজাত আর হেড্‌মাষ্টার মশাই প্রায়ই তাকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে বেত মারতেন। এইবার আমি তাকে বললুম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে।

এইবার সুশান্ত একটা শ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—যাক বাবা তবু চিনতে পারলি। আমি ত ভেবেই অস্থির হয়ত আমাকে বেকুব হয়ে ফিরতে হবে।

আমি বললুম—তোমার অনেক কীর্তির কথাই আমার মনে আছে। যদি সেই হিন্দুস্থানী ছেলেটার টিকি কাটার কথা বলতে তাহলে আমি আরও আগেই তোমাকে চিনতে পারতুম।

এইবার সুশান্তর পালা। সে বললে—কোন ব্যাপারটা, বল ত ?

আমি হেসে বললুম—কেমন ? এত সহজে ভুলে গেলে ? সেই দেওনন্দন না দেওকিশন মিশ্র বলে একজন হিন্দুস্থানী ছেলে আমাদের ক্লাসে পড়ত। বেশ ভাল মানুষ গো বেচারা। মাথায় একটা বড় টিকি। সে তার টিফিন আনত তার বাড়ী থেকে একটা ছোট টিফিন ডিবেতে। এটা সে সব সময় নিজের কাছে কাছে রাখত পাছে কেউ ছুঁয়ে দেয়। একদিন কি একটা জরুরী ব্যাপারে হেড-মাষ্টার মশাই তাকে ডেকেছিলেন। তখন আমাদের ক্লাস চলছিল। সে টিফিনের ডিবেটা হাই বেঞ্চের তলার তাকে রেখে যায়। মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে তার টিফিন কৌটা খুলে মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। আমাদের ইংরিজির স্যার তখন পড়াচ্ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে তার কাছে গিয়ে দেখেন যে টিফিন কৌটতে দুখানা আটার রুটি আর তরকারী ঠিক আছে তার ওপরে একটা কাটা টিকি আর একটা মাছভাজা। বলা বাহুল্য ঐ ছেলেটি মাছ, মাংস খেত না আর যে টিকিটা তার টিফিন কৌটায় ছিল সেটা তারই টিকি। মাথায় হাত দিয়ে টিকি না দেখেই তার ঐ অবস্থা হয়েছিল। আমরা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতেই পারিনি পরে বুঝতে পেরে সকলেই হেসে উঠেছিলুম। ছেলেটি ইতিমধ্যে হেড় মাস্টারের কাছে গিয়ে টিফিন কৌটা দেখিয়ে নালিশ জানায় আর হেড্ মাস্টার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে আসে।

হেড্ মাস্টার মশাই ছিলেন ভীষণ রাশভারী, গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি ক্লাশে এসে বললেন—কে এই অন্যায় কাজ করেছ সামনে এসে বল। যদি কেউ দেখেও থাক কে করেছে বল। আমরা কেউ কিছু দেখিনি জানিও না কে করেছে। হেড মাস্টার মশাই হুকুম দিলেন—আজ আরও তিন পিরিয়ড্ আছে। হোল ক্লাশ এই তিন পিরিয়ড্ 'নীল ডাউন' হয়ে থাকবে। যদিও আমরা দেখিনি কে করেছে তবে একাজ তুমি ছাড়া যে আর কেউ করতে পারে না সেটা আমরা সকলেই বুঝেছিলুম।

আমার কথা শুনে সুশান্ত খুব হাসল তারপর বলল—সেত বটেই

যতদোষ নন্দ ঘোষ। আর তোমাদের গুণাবলীর কথা আমারও জানা আছে। একটা তোমার কথা বলি শোন।

—বল।

—তোমার মনে আছে প্রভাত ঘোষ বলে একটি ছেলে ছিল। বেশ শান্ত-শিষ্ট আর হোম-টাস্ক আর কেউ করুক আর না করুক প্রভাত ঠিক করবেই। সব কাজে তার বেশ নিষ্ঠা ছিল। লেখা পড়ায় তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না বটে কিন্তু তার চেষ্টা ছিল অক্লান্ত। শশধর বাবুর ডিক্‌টেশনের ক্লাশে তার পেনসিলটি বেশ পরিপাটি করে কাটা থাকত খাতাটি পরিষ্কার করে সামনে ধরা থাকত। অন্য অনেক ছেলে শশধর বাবু ক্লাশে এলে তারপর পেন্সিল কাটত। এতে তিনি ভয়ানক চটে যেতেন। সকলকে বলতেন প্রভাতের মত হতে। প্রভাত বসত প্রথম বেঞ্চের শেষে। আর তুমি ঠিক তার আগে বসতে। একদিন শশধর বাবুর ক্লাশের আগে পেন্সিল, খাতা সব সাজিয়ে প্রভাত বাইরে গেছে। ইতিমধ্যে তুমি তার পেন্সিলটি মেঝেতে ঘসে বেশ করে আবার যথাস্থানে রেখে ভাল মানুষের মত বসে রইল। ডিক্টেশন নেবার সময় প্রভাতের চোখে জল এসে গেল। শশধর বাবু বুঝলেন ব্যাপারটা। তিনি তাঁর নিজের পেন্সিলটা প্রভাতকে দিলেন। আমাকে সন্দেহ করে কাছে ডেকে বললেন—এরকম কাজ কেন করলে? আমি যত বলি—স্যার আমি কিছু জানি না ততই আমার ওপর চলল নির্যাতন। কান ধরে টেনে কয়েকটা ঝাকানি দিয়ে মাথায় কয়েক গণ্ডা গাঁট্টা খেয়ে গিয়ে সীটে বসে রইলুম। আমি যদি তোমার নাম বলেও দিতুম তবু আমার কথা বিশ্বাস করত না কেউ। আরও নির্যাতনের ভয়ে চুপ করে রইলুম। শশধরবাবুর গাঁট্টা ত খাওনি তাই তার ফলটাও জান না। পরদিন মাথায় চিরুণী লাগাতে পারিনি। মাথার আট দশ জায়গায় আলুর মত ঢিপি হয়ে ফুলেছিল। শশধর-বাবুর আঙ্গুল যে কি দিয়ে তৈরী কে জানে। নীল কণ্ঠের মত সমস্ত কিছু হজম করে রইলুম। আর তুমি ভাল ছেলের খোলসের মধ্যে বেশ মজা করে রইলে। যাক্ সে ছেলেবেলার কথা মনে হলে এখন

এত হাসি পায়!

আমি বললুম—আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। স্কুল ছাড়ার পর আর ত দেখা সাক্ষাতও নেই। তা বেশ ভালই হল অনেক দিন পরে দেখা। কি করছিস এখন তাই বল।

—জানিস ত লেখাপড়ায় আমি কোন দিনই ভাল ছিলুম না। চেষ্টা করলে একচান্সে না হোক কয়েক বারে হয়ত গড়িয়ে গড়িয়ে থার্ড ডিভিসনে পাশ করতে পারতুম কিন্তু শশধরবাবুর জন্যে হল না।

—কেন? তিনি ত কার ক্ষতি করেন না।

—ক্ষতি করেন না আবার? অত্যধিক গাঁট্টা মেরে মেরে আমার ব্রেনটা নষ্ট করে দিয়েছিলেন। তা না হলে আমার চেয়ে কত আজমার্কা ছেলে পাশ করে গেল আর যাচ্ছে আর আমি চার বারেও যখন পারলুম না তখন একদিন শশধরবাবু আমাকে ডেকে বললেন—কিরে তুই কি রবার্ট ব্রুসের এত বছরের রেকর্ড ভাঙ্গবার ঠিক করেছিস। অনর্থক বাপের পয়সা নষ্ট না করে যাহোক একটা কুলি, মজুরের কাজ করেও বাপকে সাহায্য কর। অনর্থক আর এ বিড়ম্বনা কেন? লেখাপড়া তোর কর্ম নয়। আমার মুখের আগায় এসে গিয়েছিল বলি—এর জন্যে দায়ী আপনি কিন্তু ভয়ে বললুম না কি জানি যদি আবার সেই 'রামগাঁট্টা' আরম্ভ করেন। তাহলে ব্রেনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটাও যাবে। কুলি, মজুরের কাজও জুটবে না। আমি নম্রভাবে বললুম—স্যার আপনি ঠিক বলেছেন আর চেষ্টা করব না পড়ার। এইবার কোন কাজ করব। শশধরবাবু বলেছিলেন—বেশ ভাল তাই কর।

—তারপর?

—তারপর আর কি? কাজ বললেই ত আর পাওয়া যায় না। আমি খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলুম। কোথাও কিছু মিলল না। আমি হতাশ হয়ে পড়লুম। কোন দিকে কোন পথ না পেয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় একটা সুযোগ এল। ঐ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল। ঠিকাদারী কাজ আরম্ভ করলুম। প্রথম দু'চার মাস একটু অসুবিধার মধ্যে গেল তারপর কায়দা কৌশল জেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। রাস্তা

পরিষ্কার হয়ে গেল। যে জিনিসে হাত দি তাতেই সোনা ফলতে আরম্ভ করল। বহুটাকা রোজগার করলুম। মনের আনন্দে দেশ বিদেশ ঘুরে দেখলুম। এখন কাজ থেকে অবসর নিয়েছি। অনেকদিন বিদেশে থেকে মাস খানেক হল ফিরেছি।

—এখন কোথায় আছিস ?

—গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। দেশে ফিরেই আমার সবপ্রথম কার কথা মনে হয়েছিল জানিস ?

—কার ?

—শশধরবাবুর। কেন জানিনা তাঁকে দেখবার আমার বড় ইচ্ছে হয়। অনেক চেষ্টা করে আমি জুবিলি স্কুলে যাই। সেখানে এখন সব নতুন লোক। চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তখন যাদের একেবারে ছোট দেখেছি তারা এখন অবসর নেবে। ওদেরই মধ্যে একজনকে নিয়ে শশধরবাবুর কাছে যাই। বস্তীর একটা এঁদো ঘরে শশধরবাবু আর তাঁর স্ত্রী আছেন বড় কষ্টে। এখন প্রায় আশীর কাছাকাছি বয়স। চোখে ভাল দেখতে পান না। কে বলবে যে এ সেই শশধরবাবু যার গাঁট্টার ভয়ে দুর্দান্ত ছেলেরা নিস্তেজ হয়ে বসে থাকত। আমাকে ত প্রথমে মনেই করতে পারলেন না। তারপর অনেক পুরান কথা স্মরণ করিয়ে দেবার পর তাঁর মনে পড়ল। আমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কি কান্না অরিজিত। তাঁর সেই কান্নায় আমার মত দুরাত্মারও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ওঁর একমাত্র ছেলের ভরসায় থাকতেন। সেই ছেলেটিও আজ ছমাস হল মারা গেছে। এখন ভীষণ কষ্টে আছেন। কয়েক মাসের ঘরভাড়া বাকী পড়েছে। বাড়ীওয়ালা উঠে যাবার জন্যে রোজ তাগাদা করছে। বুড়ো মানুষ কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই। কোথায় যাবেন।'

—কেন তাঁর ছেলের বৌ, নাতি নেই ?

—না, ছেলে বিয়ে করেনি। অতি সামান্য রোজগার করত। কিছু সঞ্চয়ও নেই।

—তাহলে কি উপায় ?

—আমি ভাই আর থাকতে পারলুম না। যতই মারুন আর যাই করুন আমাদের মাস্টার মশাই ছিলেন। আমাদের ভালর জন্যই করেছেন। আমি তাঁর বাকী ঘর ভাড়া সব চুকিয়ে দিয়ে তার নামে ২০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি যাতে মাসে তার হাতে সুদের টাকা থেকে ৭৫৲ টাকা দেওয়া হয়। ভাই, তিনি যে কি পরিমাণে শান্তি পেয়েছেন তা আর কি বলব? আসবার সময় আমার হাত দুটো ধরে বললেন—সুশান্ত, বাবা তুমি যা করলে তা আমি কি বলব। তুমি দীর্ঘজীবি হও ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তারপর ঝর ঝর করে চোখের জল তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো বেয়ে গায়ে পড়তে লাগল। সত্যি অরিজিত ঐদিন আমার মনে এত শান্তি হয়েছে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেও সে শান্তি পাই নি

শশধর বাবুর কষ্টের কথা শুনে আমারও বেশ কষ্ট হয়েছিল। মনে মনে ভাবছিলুম—লেখাপড়া শিখে আমরা কিই-বা করতে পারলুম। ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই। তবু আমাদেরই একজন লেখাপড়া নাই বা বেশী জানল, প্রকৃত মানুষ হয়েছে।

আমি মনটা হাল্কা করতে জিজ্ঞেস করলুম—বেশ, বেশ, তোমার ছেলেমেয়ের কথা বল।

—আরে না, বিয়েই করিনি তার আবার ছেলেমেয়ে। বেশ আছি। তা তোমার খবর কি? কি করছ?

—আর ভাই জানত লক্ষ্মী আর সরস্বতীর চিরকালের বিবাদ। একটা স্কুলের মাস্টারি করি। এক রকম চলে যাচ্ছে। তিনটি মেয়ে। দুটির বিয়ে দিয়েছি শ্বশুর বাড়ীতে আছে। আর একটির বিয়ে দিলেই হয়। আরও বছর চারেক চাকরী আছে। এই মেয়েটির বিয়ে হলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

কথা বলতে বলতে আমরা প্রায় প্রিনসেপস্ ঘাটের কাছে এসে পড়েছি। সুশান্ত বললে—এস এই গঙ্গার ধারে কোন একটা জায়গায় বসা যাক। বসে বসে গল্প করব। তোমার কোন কাজ নেইত এখন?

—না, চল বসা যাক।

তখন নদীর পারে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা দুজনে বসেছি এমন সময় সুশান্ত আমাকে বললে—ঐ দেখ আমাদের দেশের ভিখিরি কেমন ইংরিজি বলছে।

কই ? বলে আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলুম একজন কাঙ্গালিনী ছেঁড়া শত তালি দেওয়া কাপড় পরে একটা ছোট ডাল্‌ডার টিন হাতে আর অন্য হাতে একটা বেঁকা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক বিদেশিনী পর্যটককে বলছে—মামি, গিভ মি এ পাইস। তার ইংরিজি উচ্চারণ খাঁটি বিলিতি ধরণের। আমরা দুজনেই সে দিকে চেয়ে আছি। কাঙ্গালিনী বলে চলেছে—Extremely poor madam, please help me.

বিদেশিনী বোধ হয় ভারতবর্ষের বিশেষ করে কলকাতার এক কাঙ্গালিনীর মুখে এই রকম ইংরিজি শুনে একটু বিস্মিতই হয়েছিল কিন্তু তাঁদের দেশে বোধ হয় এভাবে রাস্তা ঘাটে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ তাই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। সুশান্ত আমাকে বললে—দেখ, ভিখিরি কেমন ইংরিজি শিখেছে।

আমি তখন সুশান্তকে বললুম—সুশান্ত, এ সাধারণ ভিখিরি নয়। এর খবর তুমি জান না। এর এক বিরাট ইতিহাস আছে, আমি জানি। শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।

সুশান্ত বললে—তুমি ত আগে কল্পনার রাজ্যে বাস করতে ভাল বাসতে। সে অভ্যেস কি এখনও রেখেছ ?

আমি বললুম—স্বভাব কি আর বদলায় ভাই ? বদলায় না।

—তাহলে এ ভিখিরিকে নিয়ে তোমার কল্পনার রাজ্যে কি সৃষ্টি করেছ বল।

—না ভাই কল্পনার কথা নয়। এ একেবারে খাঁটি বাস্তব আর খাঁটি বাস্তব জেন অনেক সময় কল্পনার চেয়েও আশ্চর্যজনক হয়। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

—কি সেই আশ্চর্য বলত তাহলে শুনি।

আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললুম—এই ভিখিরিকে তুমি আজ এই রকম জরাজীর্ণ কুৎসিত দেখছ। ও কিন্তু ওর যৌবন কালে অসামান্যা সুন্দরী ছিল। আমি যখন ওকে প্রথম দেখি তখন ওর যৌবনে ভাঁটা পড়ে গেছে কিন্তু তখনও আমি ওর যে চেহারা দেখেছি তাতে ওর পূর্ণ যৌবন কালে ও কি ছিল তার কিছুটা আভাষ পেয়েছি। আমি তোমাকে বলছি শোন।

ভারত বিভাগের আগে তোমাব বোধ হয় মনে আছে এই কলকাতায় একজন খুব নাম করা মুসলমান ছিলেন। তাঁর নাম ছিল স্যার হালিম আহম্মদ। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে এই ভদ্রলোক বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অতি ভদ্র ও বিনয়ী। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই তাঁর কাছে সমান ভাবে উপকৃত ছিলেন। বলতে কি, আমি যে সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করছি তাঁরই সাহায্যে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তাঁব কোন মেয়ের যেন কি গোলমাল হয়েছিল তাঁর জামাইয়েব সঙ্গে।

—তুমি ঠিকই বলেছ। হালিম সাহেবের দুই মেয়ে রেহানা আর সুলতানা। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। দুই মেয়েকেই তিনি লরেটো থেকে পড়িয়ে পাশ করান। বড়টির একজন আই. সি এস এর সঙ্গে বিয়ে হয়। আব ছোটটির বিয়ে হয় একজন বেশ বড় রেলওয়ে অফিসারের সঙ্গে। তুমি অবাক হয়ে যাবে। এই ভিখিরিই সেই ছোটমেয়ে সুলতানা।

সুশান্ত আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে—কি বলছ তুমি? হালিম সাহেবের ছোটমেয়ের রূপ লাবণ্যের খ্যাতি তখনকাব দিনেব কাগজেও বেরিয়েছিল। এই ভিখিরি, সেই সুলতানা? কি করে সম্ভব হয়?

আমি বললুম—দেখ, অযথা কার নামে কিছু বলা আমি পছন্দ করি না আর তাছাড়া হালিম সাহেবকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি ও তাঁর কাছে আমি উপকৃতও। তুমি যদি আমার কথায় বিশ্বাস কর

তাহলে বলব আর তা না হলে থাক।

সুশান্ত—আরে না না অবিশ্বাস করব কেন? তবে কি জান ব্যাপারটা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না। তবে তুমি যখন বলছ সত্যিঘটনা বল আমি শুনি।

আমি বলতে লাগলুম—সুলতানা বিয়ের পর খুব খুশী হতে পারে নি। তার স্বামী মিঃ রহমান ছিলেন সুপুরুষ ও মার্জিত রুচির। তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। প্রগলভতা তিনি পছন্দ করতেন না। সুলতানা চাইত নাচ, গান, মজলিস এই সমস্ত কিন্তু মিঃ রহমান এসব পছন্দ করতেন না। তাঁর সংযত স্বভাবের বিরুদ্ধে ছিল এই সব। এর ফলে বিয়ের ২।৩ বছরের মধ্যেই তাঁদের দুজনের মধ্যে সামান্য কারণে মতবিরোধ দেখা দিল। মিঃ রহমান কিন্তু সুলতানাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সে ইচ্ছামত পার্টিতে যেত, ভোজসভায় যেত। মিঃ রহমান কোনদিন আপত্তি করতেন না। তিনি থাকতেন বইএর মধ্যে ডুবে। চাপরাসী, খানসামা এরাই তাঁর তত্ত্বাবধান করত। অনেক রাতে মিঃ রহমান পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়তেন। খাবার যেমন চাপা তেমনই থাকত খাওয়া হত না। সুলতানা প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন পার্টিতে যেত। রোজই অনেক রাতে ফিরে নিজের ঘরে যাবার সময় দেখত মিঃ রহমান হয় পড়ছেন না হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। মিঃ রহমানের কাছে এসে কথা বলার সৌজন্যও তার ছিল না।

'এক একদিন রাত্রে সুলতানা বাড়ীতেই ফিরত না। মিঃ রহমান মুখে কোনদিন কোন প্রতিবাদ করতেন না। মনে মনে অত্যন্ত অশান্তিতে ছিলেন। তিনি জানতেন প্রতিবাদ করলেই গোলমাল হবে আর চাকরনকরদের সামনে সেটা হবে বড়ই বেমানান। তাই তিনি নিজের মনেই পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন। এইভাবে চলতে রইল।

সুশান্ত—কিন্তু মিঃ রহমান তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীকে কনট্রোল করার কোন চেষ্টা করলেন না? এটা আমি সমর্থন করতে পারলুম না। তারপর?

—এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধল। সুলতানা এখন উচ্ছৃঙ্খলতার শেষ সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। যুদ্ধ লাগাতে তার বেশ ভালই হল। বিভিন্ন বারে এবং হোটেলে তখন আর্মি অফিসারের ছড়াছড়ি। ভাল ইংরিজি বলতে পারার জন্যে তার আর্মি অফিসারদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টতা হল। ৪০০নং ক্লাবে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করল সুলতানার জন্যে একজন আর্মি অফিসার। সুলতানা এতদিন মাঝে মাঝে মদ খেত। এখন থেকে সে নিত্যই মদ খেতে আরম্ভ করল। বাড়ীতে সে কখন কখন আসত। কখন বাড়ীতে আসে আর কখন যায় তা মিঃ রহমান জানতে পারেন না আর তিনি জানতেও চান না। তবে তাঁর স্ত্রী যে তাঁর নাগালের বাইরে অনেকদিন আগেই চলে গেছে এটা তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন কেবল লোক লজ্জার ভয়ে কিছু বলতেন না। সুলতানা মিঃ রহমানের নির্বিরোধ স্বভাবের সুযোগ নিয়ে পূর্ণমাত্রায় পাপের পথে এগিয়ে চলতে চলতে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল যেখান থেকে আর ফেরা যায় না।

এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। মিঃ রহমানের অফিসে একজন অফিসার বদলী হয়ে এলেন অন্য জায়গা থেকে। এঁর নাম মহঃ ইশাক। ইনি মিঃ রহমানের সমবয়সী কিন্তু মোটেই গম্ভীর প্রকৃতির নয়। সব সময় হাসিখুশী বেশ হৈহুল্লোড় পছন্দ করেন। ইনি আজ-কাল মিঃ রহমানকে ছুটির পর দু একটা জায়গায় নিয়ে যান। একদিন মিঃ ইশাক. মিঃ রহমানকে ছুটীর পর নিয়ে গেলেন একটা বেশ নাম করা হোটেলে। বড় বড় আর্মি অফিসারে হোটেল ভর্তি। ভোর থেকে রাত দুটো পর্যন্ত হোটেলটা থাকে প্রাণ চঞ্চল। সন্ধ্যার পর থেকে এখানে বসে রূপসীর হাট। তাদের চলা ও বলার কায়দাই আলাদা। কেউ কথা বলার মাঝে মাঝে কাঁধ দুটো ঝাঁকানি দিচ্ছে কেউ আর একজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।

রহমানের এ রকম বেহায়াপানা ভাল লাগে না। তাঁর কিছু বলারও উপায় নেই। মিঃ ইশাক তাঁকে সঙ্গে এনেছেন। নাক চোখ বন্ধ করে তেতো পাঁচন খাবার মত তাঁর অবস্থা। হলের এক ধারে

একটা জায়গা বেছে নিয়ে ইশাক মিঃ রহমানকে নিয়ে বসলেন। তারপর অর্ডার প্লেস করলেন। মিঃ রহমান চুপ করে বসে আছেন।

খাওয়া আরম্ভ হবার পর মাইকে ঘোষণা হল—Ladies and Gentlemen, your attention please. To night's attraction is floor show by the most vivacious girl miss Eve-de-Beauty.

হলের মধ্যে যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছিল তা যেন কোন যাদুমন্ত্রে স্তব্ধ হয়ে গেল। হলের বড় বড় আলোগুলো একটা একটা করে নিভে গেল। কেবল কয়েকটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলতে রইল। সকলেই অধীর আগ্রহে চেয়ে রইল কার প্রতীক্ষায়। এমন সময় কন্‌সার্ট আস্তে আস্তে বেজে উঠল। বাজনার তালে তালে পা মিলিয়ে মিলিয়ে ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল এক লাবণ্যবতী নারী। সকলকে অভিনন্দন করে সেই নারী দাড়াল ফাঁকা জায়গার মাঝখানে। এইবার বাজনা একটু জোরে বাজতে লাগল। সেই নারী ধীরে ধীরে তার সমস্ত বহিবারণ খুলে ফেলল। কেবল মাত্র একটি ছোট বক্ষাবরণ ও একটি ছোট নিম্নাবরণে আবৃত থেকে বাজনার তালে তালে নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী সহকাবে নাচতে লাগল।

নাচতে নাচতে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর সামনের সারিতে কার' মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কার' বা পাশে বসে পড়ছে।

মিঃ রহমান আলো আধারের মধ্যে অনেকক্ষণ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা কি সন্দেহ বার বার উঁকি দিতে লাগল। তিনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে নাচের জায়গাটা বেশ তফাতে। ১নং নাচ হবার পর বড় আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় মিঃ রহমান পরিষ্কার দেখতে পেলেন Eve-de-Beauty আর কেউ নয়। এ তার বিবাহিতা স্ত্রী সুলতানা।

মিঃ রহমানের ঘেন্নায় গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। আর বসে থাকবে কিনা ভাবছে এমন সময় আবার মাইকে ঘোষণা হল—Ladis and gentlemen, your attention please. At

the request of our innumerable patrons, our next show is 'Strip-tease by Eve-de-Beauty.

মিঃ রহমান আর চিন্তা করতে পারলেন না। এত লোকের মধ্যে সুলতানা উলঙ্গ নাচ দেখাবে? হঠাৎ মিঃ রহমানের মাথার দুপাশে ভীষণ যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করল। তাঁর কপালের দুই দিকে দুটো শিরা দড়ির মত ফুলে উঠে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়াতে তিনি মিঃ ইশাককে বললেন তখনি তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। মিঃ ইশাক আর নাচ দেখতে পেলেন না। অসুস্থ সঙ্গীকে নিয়ে তখনি ডাক্তারের কাছে যাবার জন্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে পডলেন।

সুশান্ত—তারপর, মিঃ রহমান সেরে উঠলেন?

—হ্যাঁ উনি সাতদিন নার্সিংহোমে ছিলেন। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বলেছিল যে Mild heart attack, complete rest মাস খানেক নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে সুলতানার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদেব পাকাপাকি কবে লক্ষ্ণৌতে নিজের বদলী করে নিয়ে চলে গেলেন।

সুশান্ত—সুলতানাব কি হল?

—সুলতানা তখন বাঁধন ছাড়া হয়ে আরও আনন্দে নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চলতে লাগল। এই সময়ে সে ঐ হোটেলেরই একটা ঘরে এক আর্মি-অফিসারের সঙ্গে থাকত। রোজ মদ খাওয়া আর উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে তার জীবন কাটতে লাগল। আর্মি-অফিসার তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে এই আশ্বাস দিয়েছিল কিন্তু তা হল না। একটা জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে আর্মি-অফিসারকে যেতে হল ফ্রণ্টে। যাবার সময় সে সুলতানাকে বলে গেল যে ফ্রণ্টে তার কাজ শেষ হলে সে ফিরে এসে বিয়ে পাকাপাকি করবে। প্রথমে কয়েক মাস কিছু কিছু টাকা আর্মি-অফিসার সুলতানাকে পাঠিয়েছিল কিন্তু তারপর আর কোন চিঠি বা টাকা আসত না। সুলতানা কয়েকটা চিঠি দিয়েছিল তার কোন জবাব পায় নি।

এতদিন যৌবনের গরিমায় সুলতানা ভেবেছিল যে বরাবরই বোধ হয় এক ভাবেই যাবে। কিন্তু সে ভুল করেছিল। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্যে প্রকৃতি তার পুরা কর আদায় করেছিল সুলতানার কাছে। কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃতি তার বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করে না। সুলতানার বেলাও একই ফল হল। এতদিন যে ভাবে জীবন কাটছিল সেই জোয়ারে ভাঁটা পড়ল। সুলতানার জীবনে এল ভীষণ অবসাদ। সুলতানাকে না পেলে যাদের চলত না এখন তারা সুলতানাকে দেখলে পাশ কাটিয়ে চলতে লাগল যেন কত অপরিচিত। ক্যাবারেতে আর কোন চাহিদা নেই। কারও কাছে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। এই ভাবে জমা টাকা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তার অর্থ কষ্ট হতে লাগল। বড় হোটেলের ঘর ভাড়া ও অন্যান্য ঠাঠ বজায় রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে সে বড় হোটেল ছেড়ে একটা ছোট হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিল। তার হৃত যৌবনের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল সেইটুকু সম্বল করে সময় কাটাবার চেষ্টা করতে লাগল।

তার এই দুশ্চরিত্র স্বভাবের জন্যে তার বাবা স্যার হালিম আহমেদ তাকে আর কাছে আসতে দিতেন না। তার বোন ভগ্নীপতিও তার সংস্রব ত্যাগ করল। এখন সুলতানা একেবারে একলা। এত শীঘ্র যে সে অত উঁচু থেকে এত নীচুতে পড়বে তা সে ধারণা করতে পারে নি।

দুশ্চিন্তায় তার কপালে আর মুখে বলিরেখা দেখা দিল। কদিনের মধ্যে তার বয়স বেড়ে গেল কবছরের মত। সে আজ একেবারে একা। আজ সে উপলব্ধি করল যে সে এতদিন কি ভুলই না করেছে? কিন্তু সে বুঝতে পারল অনেক পরে যখন আর শোধরাবার কোন রাস্তা নেই। কয়েকদিন ধরে সে অনেক ভাবল। তারপর ঠিক করল যে মিঃ রহমানকে একবার যদি ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখে কেমন হয়। তাই স্থির করে সে মিঃ রহমানের করুণা ভিক্ষা করে একটা বেশ বড় করে চিঠি লিখল। তাতে বারবার খোদার নামে শপথ করে জানাল যে সে আর কোনদিন মিঃ রহমানের কথার অবাধ্য হবে না। মিঃ রহমান যেন তাকে ক্ষমা করেন। তারপর চোখের জল দিয়ে খাম এঁটে

মিঃ রহমানের লক্ষ্ণৌয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল।

মনে অনেক আশা নিয়ে সুলতানা মিঃ রহমানের উত্তরের অপেক্ষায় কাটাল। রোজই ভাবে আজ উত্তর আসবে কিন্তু ডাক বিলি হবার সব সময়গুলোই চলে গেল। এই ভাবে দশ দিন কেটে গেল। সুলতানা হতাশ হয়ে পড়ল। এগার দিনের সকালে পিওন তার হোটেলে এসে দরজা নাড়া দিতে সে ব্যস্ত ভাবে পিওনের হাত থেকে চিঠি নিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এটা তারই লেখা চিঠিটা ফিরে এসেছে লক্ষ্ণৌ থেকে। চিঠির গায়ে লেখা আছে 'Address not traced', সুলতানা হতাশ হয়ে তার ঘরের চেয়ারে বসে পড়ল। সে অনেক আশা করে মিঃ রহমানকে চিঠি দিয়েছিল। তার আর অন্য রাস্তা রইল না।

এখন সুলতানা নিজের খরচ চালাবার জন্যে ছোট ছোট রেস্তোরাঁতে খদ্দের ধরবার জন্যে যায়। অদৃষ্টের কি পরিহাস! এ কি সেই সুলতানা যাকে কাছে পাবার জন্যে, যার ঠোঁটের বেঁকা হাসি দেখার জন্যে শত শত গুণগ্রাহী পাগলের মত ঘুরত! একি সেই সুলতানা যে এক এক রাতে হাজার টাকা উপায় করেছে? একি সেই সুলতানা যার পোষাক দেখে ধনী রমণী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকত? না, এ আর এক সুলতানা, যে এখন মাঝে মাঝে এক আধটা খদ্দের পায় অতি সাধারণ লোক এবং যে উপায় হয় তা দিয়ে তার হোটেল ভাড়া দিয়ে অন্য খরচা চলে না। এখন সবদিন সে অভিসারে বেরতেও পারে না। অত্যধিক মদ খাওয়ায় তার লিভার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে প্রায়ই লিভারের যন্ত্রণায় তার হোটেলে ময়লা বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করে আর ভাবে তার দুঃখের কথা। যখন তার সময় ভাল ছিল তখন যদি সে কোনদিন একবার বলেছে যে তার শরীর খারাপ তখন কত লোক তার জন্যে ভাল ডাক্তার নিয়ে আসার জন্যে উমেদার হয়ে থাকত, আর আজ! কোথায় এক অখ্যাত হোটেলের একটা স্যাৎস্যাতে ঘরে সে একলা যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। মনে মনে তার হাসি পায়। সে ভাবে এই সমস্ত লোকের কথা যারা তাকে সুখের স্বর্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

এভাবে আর কদিন চলতে পারে? হোটেলের ঘর ভাড়া দু মাসের বাকী পড়ল। হোটেল মালিক তার জিনিস পত্র আটকে তাকে হোটেল থেকে বার করে দিল। সে থানায় দৌড়ল কিন্তু কোন ফল হল না। সে কোনখানে আশ্রয় পেল না, সমাজের কোনখানে তার স্থান হল না। এত লেখা পড়া শিখে, এত উঁচু ঘরে জন্মে সে পথের ভিখিরি হল। শেষ পর্যন্ত সে গিয়ে মিশল ঐ কাঙ্গালীদের দলে। এখানে অন্ততঃ আর কিছু না হোক খাবারের কোন ভাবনা নেই, যেমন করে হোক দু বেলা খেতে পাবেই আর থাকার জন্যে গাছতলার কোন অভাব নেই।

এই সামনের ইংরিজি বলা ভিখিরি আর কেউ নয়। এ, সেই সুলতানা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুশান্ত বললে—তোমার কথা যদি সব সত্যি হয় তাহলে বাস্তবিকই এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। সত্যিই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—

মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বম্
কাল হরতি নিমেষাৎ সর্ব্বম্।

"সত্যিই তাই" বলে আমারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। তখনও আমার কানে আসছে দূর থেকে—Give me a pice madam. Extremely poor madam.

শঠে শাঠ্যং

অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় রেল অফিসে কেবানীর কাজ করেন। তাঁর সংসারে তিনি, তাঁর স্ত্রী বনশ্রী আব একটি মাত্র মেয়ে তনুশ্রী। বনশ্রী অত্যান্ত হিসেবী। সমস্ত কাজ নিজেব হাতে করেন।

কলকাতার উপকণ্ঠে একটা ছোট পৈতৃক বাড়ী আর তাব চারপাশে যে সামান্য জায়গা আছে সেখানে বারমাস মরশুমি ফুলের গাছ লাগান হয়, কেবল বাড়ীর দুপাশে দুটো মাধবীলতা পাকাপাকি ভাবে আছে। এই দুটী লতায় যখন থোকো থোকো ফুল ভরে থাকে, এই পুরাণ বাড়ীটার সৌন্দর্য বেড়ে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা জাতীয় পাখী এসে এই দুটো লতার ঘন পাতার মধ্যে বসে, মনের আনন্দে গান গায় আবার নীল আকাশের গায় উড়ে যায়।

অতনুর ছোট সংসাব বেশ আনন্দের সঙ্গে দিন কাটায়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখার জন্য অযথা অভাবের মধ্যে অতনুকে পড়তে হয়নি কখন।

তনুশ্রী ক্রমে ক্রমে স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হল। সে তার মার মতনই চৌখশ। যেমন লেখা পড়ায়, তেমনি গান বাজনায়, তেমনি আবার সংসারের কাজ কর্মে।

সময় এক জায়গায় স্থির থাকে না। সে তার নিয়ম মত এগিয়ে চলে। ধীরে ধীবে তনুশ্রীব কলেজের পড়া শেষ হল। সে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করল। এদিকে অতনুরও কাজ থেকে অবসব নেবার সময় হয়ে গেল। তনুশ্রী যদিও ভাল ভাবে পাশ করেছিল সে আর পড়তে চাইল না। অতনু ও বনশ্রীও তাকে বলেছিল আরো পড়ার জন্যে কিন্তু সে রাজি হল না।

মেয়েরা যতদিন পড়াশোনা করে ততদিন বাবা, মা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকেন কিন্তু পড়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা হয় কি করে মেয়েকে ভাল জায়গায় বিয়ে দেওয়া যায়। তনুশ্রীব বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। অতনু ও বনশ্রী মেয়ের জন্যে খোঁজ খবর আরম্ভ

করতে লাগলেন।

অতনু অবসব গ্রহণ বরার সময় প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে হাজাব ত্রিশ টাকা আর গ্রাচুইটি আবও হাজাব পনব এই দুই মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজাব টাকা পেল। এ ছাড়া তাব পাঁচ হাজাব টাকা ইন্সিওর ছিল। তার ইচ্ছা ছিল মেয়েব বিয়েতে বিশ থেকে পাঁচশ হাজার টাকা খবচ কববে এবং বাকি টাকা দিয়ে তাঁর আব বনশ্রীর বাকি দিনগুলো ভাল ভাবেই কেটে যাবে। বনশ্রীও তাই চেয়েছিল। আরম্ভ হল পাত্র খোঁজার পালা। দু চারজন ভাল ঘটককেও লাগান হল। এ ছাড়া খবরেব কাগজে কোন ভাল পাত্রেব সন্ধান পেলে সেখানে খবরা-খবব নেওয়া আরম্ভ হল। অতনুর এখন অনেক অবসর। খোঁজা খুঁজি কবতে তাব কোন অসুবিধে নেই। অতনু অনেক জায়গায় গেল। পাত্র পছন্দ হয় ত ঘব পছন্দ হয় না, আবাব ঘর পছন্দ হয় ত পাত্র পছন্দ হয় না। এই ভাবে কয়েকটা মাস কেটে গেল।

একদিন কাগজেব এক বিজ্ঞাপনে একটি ভাল পাত্রেব সন্ধান পেল। ছেলেটির বয়স সাতাশ বছর। কেমিষ্ট্রীতে ডকটরেট, একটি সবকারী সংস্থাব ক্লাশ ওয়ান অফিসার। বারশ টাকা মাইনে। পাত্রের বাবা, মা, বর্তমান। এদের বাড়ী হাওড়ায় তবে ছেলের কর্মস্থল মধ্যপ্রদেশে।

যদিও মেয়েকে অনেক দূবে থাকতে হবে তবু ছেলেটি বেশ উপযুক্ত তাই অতনু আব বনশ্রী দুজনেই এই ছেলেটিব সম্বন্ধে খববাখবব আরম্ভ করল। কাগজে যেদিন খবব পাওয়া গেল সেই দিনই বিকালে অতনু হাওড়ায় ছেলের বাবাব কাছে গিয়ে সমস্ত খববাখবর নিয়ে তনুশ্রীকে দেখতে আসবাব কথা পাকা করে এল। পাত্রটি বাপের একমাত্র ছেলে। তার একটি মাত্র বোন আছে যার আজ থেকে চারবছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে এবং একটি দুবছরের ছেলে আছে। বাড়ীতে দুই কর্ত্তা আর গিন্নী ছাড়া আর কেউ নেই।

বনশ্রীর বেশ পছন্দ হল এই ছোট সংসাবটি। তনুশ্রী এখানে বেশ আদর যত্নে থাকতে পারবে। একটি মাত্র মেয়ে কত আদরের,

তার কি যেখানে সেখানে বিয়ে দিতে পারে? মেয়ে কাছ ছাড়া হবে ভাবতেও যেন বনশ্রীর ভাল লাগে না। কেবল মনে হয় মেয়ে চলে গেলে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। কি নিয়ে থাকবে তারা। বনশ্রী অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সে ভুলেই যায় যে সামনের রবিবার ছেলের বাবা আর মা তনুশ্রীকে দেখতে আসবেন। আর ত মাঝে দুটোদিন আছে।

দুদিন ধরে বনশ্রার চারিদিক পরিপাটি করতে কেটে যায়। বনশ্রার বাড়ী সাধারণতঃই বেশ ফিটফাট, পরিষ্কার কিন্তু আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলে সেই বাড়ীটিকে।

যথা সময়ে রবিবার পাত্রের বাবা আর মা এলেন তনুশ্রাকে দেখতে। তনুশ্রী দেখতে অতি সুন্দরা। যেমন গায়ের রং, তেমনি তার গড়ন। লেখা পড়া, গান বাজনা ও সংসারের যাবতীয় কাজে পটু। এরকম মেয়েকে দেখে পাত্রের বাবা ও মা অত্যন্ত খুশী হলেন। তাঁরা স্পষ্ট বলে গেলেন যে তাঁরা অনেকগুলি মেয়ে দেখেছেন তবে তনুশ্রীকে তাঁদের বড় পছন্দ হয়েছে। বিয়েতে তাঁদের সম্পূর্ণ মত আছে। তবে একবার তাঁরা ছেলেকে দেখবার জন্যে' বলবেন। তাঁরা বলে গেলেন যে তাঁরা ছেলেকে চিঠি লিখবেন যত শীঘ্র পারে যেন কলকাতায় আসে। ছেলের চিঠি পেলে তাঁরা জানিয়ে দেবেন অতনুকে। এই বলে সামান্য জলযোগের পর তাঁরা বিদায় নিলেন

পাত্রের বাবা আর মা চলে যাবার পর অতনু আর বনশ্রী তাদের কেমন লাগল সেই বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। অতনু বলল যে বাবা ও মা দু জনকেই তাঁর ভাল লেগেছে কিন্তু বনশ্রীর মতে পাত্রের মা বেশ সাদাসিধে কিন্তু বাবাকে মনে হয় বেশ ধুরন্ধর। অতনু বলল—কি জানি ঠিক বুঝতে পারিনি তবে আমাদের প্রয়োজন ছেলেকে। তাকে দেখে যদি পছন্দ হয়, তনুশ্রী যদি পছন্দ করে তবেই বিয়ের কথা। আমাদের যত পছন্দই হোক তনুশ্রীর পছন্দ ছাড়া কোন মতেই বিয়ে দেব না।

প্রায় মাসাধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেল। পাত্রের বাবা কোন

খবর দিলেন না। মেয়ের বাবার পক্ষে আর নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। একমাস যে অনেক সময়। অতনু একদিন ঠিক করল যে ছেলের বাড়ীতে গিয়ে খবর আনবে। আরও দুদিন অপেক্ষা করল। না আর ত চুপ করে থাকা যায় না। একদিন পাঁজি দেখে ভাল সময়ে বেরিয়ে পড়ল খবর আনবার জন্যে।

অতনু যখন পৌঁছাল তখন পাত্রের বাবা এবং মা বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁরা বেশ যত্নসহকারে অতনুকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। তারপর কুশল বিনিময়ের পর বললেন—আমরা দু একদিনের মধ্যেই আপনাকে খবর দেবার ঠিক করেছিলাম। আমাদের ছেলে আসছে দশদিন পরে। ছুটী পায় না তাই আমরা চার, পাঁচটা মেয়ে দেখে রেখেছি। যে মেয়ে দেখে পছন্দ করবে সেখানেই বিয়ের কথা পাকা করে ফেলব। ছেলের বাবা অরিন্দম মুখার্জি বললেন—ছেলে কলকাতায় এসে পৌঁছালেই আপনাদের খবর পাঠিয়ে দেব।

কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে অতনু একটু হাল্কা মনে বাড়ীর পথে পা বাড়াল। আজ অতনু মনে করেছিল যে তার কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে। রোজ বেরন সম্ভব হয় না। তার পিসীমার বাড়ী বাগনানে একবার যাবার মনস্থ করল। একটা সাইকেল রিক্সায় চড়ে বলল—চল সাঁতরাগাছি স্টেশন; এখন কি বাগনান যাবার ট্রেন পাওয়া যাবে? রিক্সাওয়ালা জবাবে বললে—আজ্ঞে আর আধ ঘণ্টা পরে খড়গপুর লোকাল আছে। আমি আপনাকে গাড়ী ধরিয়ে দেব। এই কথা বলার পর সে সাইকেলের প্যাড্‌লের ওপর সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করে খুব জোরে সাইকেল চালাতে লাগল।

রিক্সায় বসে অতনুর মন চলে গেল চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। প্রতি বছর সে ছোট পিসীর বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় যেত। কি আনন্দ, হুল্লোড়ই না করত! তখন সকলের মনের আনন্দ প্রতিটি কাজের মধ্যে প্রকাশ পেত। পূজার কদিন সবাই যেন নিকট আত্মীয়ের মত। মনে পড়ে ষষ্ঠীর দিন, ছোট পিসী যত আত্মীয়, স্বজন, বাড়ীর ঝি, চাকর সকলকে নতুন কাপড় দিতেন। অন্দর মহলে নাপতে বৌ,

লক্ষ্মীর মা, বিন্দু ঝি, আরো কত মেয়ে ছেলে হিমসিম খেয়ে যেত ফরমাস খাটতে খাটতে। এক দিনেব ঘটনা তার মনে আছে। নাপতে বৌএর ছেলে তাব কাপড় পছন্দ হযনি বলে বায়না করছিল। নাপতে বৌ অনেক বোঝাবাব পরেও যখন তাকে সামলাতে পারল না তখন তাকে বেশ কয়েক ঘা দিল। পিসীমা সেখানে চেঁচামেচি শুনে এসে সমস্ত শুনে নাপতে বৌকে খুব বকলেন—ওকি নাপতে বৌ, আজ ষষ্ঠীর দিন তুমি ছেলের গায়ে হাত তুলেছ কেন ? তারপর নাপতে বৌএর ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন—ছিঃ বাবা আজ কাঁদতে নেই এস তোমায় আমি আর একটা ভাল কাপড় দিচ্ছি" এই বলে নিজের ছেলে শৈলর কাপড়টা তাকে দিলেন। ছোট ছেলে অত বোঝে না, শৈলর কাপড়টা পেয়ে সে মহাখুশী। তাব মুখে হাসি দেখা গেল। তার চেয়েও বেশী খুশী হলেন পিসীমা।

নাপতে বৌএর তারপর কি কান্না! পিসীমার পায়ে শুয়ে পড়ে তার কান্না আর থামে না। পিসীমা যত তাকে বলেন, ওঠ বৌ ওঠ অনেক কাজ পড়ে আছে, নাপতে বৌ ততই পা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। অনেক পরে সে পিসীমার পা ছেড়ে উঠে বলল—মা, তুমি অত গরীবের দুঃখ বুঝতে পার। আমি দুঃখে কাঁদছি না মা, আমার চোখের জল নিজেই আসছে কোথা থেকে জানি না মা।

পিসীমা তাকে বললেন—চল বৌ এখন ওকথা থাক। চল আমাদের এখন অনেক কাজ আছে।

অতনু অবাক হযে পিসীমার দিকে চেয়েছিল। পিসীমার ব্যবহারে কোন অহঙ্কার নেই অতি স্বাভাবিক ভাব। তারপর দুপুবে অতনু যখন বাড়ীর ভেতরেব বারান্দা দিয়ে যায় তখন তার কানে এসেছিল পিসীমা কাকে বলছেন—তাতে কি হয়েছে, আমার শৈলর ত চাইলেই কাপড় হবে কিন্তু নাপতে বৌ কোথায় পাবে বল ?

তখন অতনুর বয়স ছিল কম। অত তলিয়ে ভাবতে শেখে নি। আজ সেই মহীয়সী দেবী তুল্য পিসীমার কথা মনে হলে তার চোখ জলে ভরে আসে। আজ পিসীমা নেই। দুর্গাপূজা আজও হয়। প্রতিবারে

অতনুরা যেতে পারে না।

শৈল অতনুর চেয়ে বছর চারেকের ছোট হবে। সে তার মার সমস্ত গুণই পেয়েছে। অতনু কয়েকটা ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে বনশ্রীকে সব কথা জানাল।

বনশ্রী সমস্ত শুনে বললে—ভাল কথা আমরাও চুপ করে বসে থাকব না। আমরাও অন্য পাত্রের সন্ধান করতে থাকি। যেখানে ভবিতব্য আছে সেখানেই বিয়ে হবে।

অতনু চেষ্টা করে। দু চারটে খবর পায় কিন্তু ঘটকের খবর সব সময়ে ঠিক হয় না। অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে খবর দেয়। অতনু যায় কিন্তু পছন্দ হয় না। বিফল মনে ফিরে আসে।

কয়েক দিন এইভাবে কাটবার পর একদিন অতনু একটা চিঠি পেল। চিঠিটা তারই নামে লেখা—

প্রিয় মহাশয়,

আমার ছেলে শ্রীমান পঙ্কোজ পনর দিনের ছুটীতে এসেছে। সে তার দুজন বন্ধুকে নিয়ে আপনাদের ওখানে আগামী তের তারিখে যাবে আপনার কন্যাকে দেখার জন্য।

আশাকরি আপনারা কুশলে আছেন। নমস্কারান্তে,

ভবদীয়

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।

বনশ্রী বললে "তের তারিখ ত কাল। কোন সময়ে আসবে তাত লেখেনি। মনে হয় বিকেলেই আসবে। তা যাইহোক সকাল থেকেই তৈরী থাকতে হবে।

পরদিন বেলা তিনটের সময় পাত্র তার দুই বন্ধুর সঙ্গে এল মেয়ে দেখতে। অতনু ও বনশ্রী আদর যত্নের ত্রুটী করলেন না। পাত্র বেশ সুপুরুষ। তনুশ্রীর সঙ্গে সুন্দর মানাবে। অতনু আর বনশ্রী মনে মনে বেশ খুশী হল। পাত্রের বন্ধুরা ভদ্রভাবে দুচারটে কথা জিজ্ঞেস করল। তনুশ্রী বেশ সহজ সরল ভাবে উত্তর দিল। পাত্র নিজে কোন কিছু জিজ্ঞেস করল না।

জল খাবার দেবার সময় অতনু পাত্রের বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল তাদের পছন্দ হয়েছে কিনা। তারা পরিস্কার বলে গেল—হ্যাঁ তাদের এবং পাত্রের নিজের পছন্দ হয়েছে, আপনারা পাত্রের বাবার কাছে কথা পাকা করতে পারেন।"

এর পরে খুব বদান্যতার সঙ্গে বিদায় দেবার সময় অতনু বললে—আমি কাল অরিন্দম বাবুর কাছে যাব আলোচনার জন্য। তারপর নমস্কার বিনিময়ের পর বাড়ীর ভেতরে গেলেন।

বনশ্রী দরজার আড়াল থেকে সব কিছু শুনেছিল। অতনু বাড়ীর ভেতরে আসতে বললেন কাল আমিও তোমার সঙ্গে যাব। মেয়ে ছেলে সঙ্গে থাকলে অন্যায় আব্দার বা দাবী করতে পারবে না।

অতনু জবাব দিল—বেশ তাই হবে। তারপর একটু গলার স্বর খাট করে জিজ্ঞেস করলে—তনুর পছন্দ হযেছে ত ?

বনশ্রী হেসে বললে—হাঁা।

পরদিন সকালে সামান্য কিছু জলযোগ সেরে অতনু এবং বনশ্রী অরিন্দম বাবুর বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। সারা রাস্তা দুজনে অনেক আলোচনা করতে করতে অনেক পরামর্শ করতে করতে গেল। কি ভাবে কথা আরম্ভ করা হবে কোন কথার কি জবাব দেওয়া হবে দুজনে পরামর্শ করে চলতে লাগল।

অরিন্দম বাবু এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই অতনুদের আপ্যায়ন করে বসালেন। তারপব দীর্ঘ আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে দশ হাজার টাকা নগদ দিতে হবে আর তা ছাড়া অতনুরা তাঁদের খুশীমত অন্যান্য জিনিস দেবেন। আর একটা কথা এই যে এই দশ হাজার টাকা নগদের পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ বিয়ের পনর দিন আগে দিতে হবে অরিন্দম বাবুর মেয়ের ঠিকানায় আর বাকি পাঁচ হাজার বিয়ের দিন রাত্রে দিতে হবে।

অতনু বললেন—আমি নগদের পাঁচ হাজার আপনার কথা মত আগেই দেব তবে আপনাকে দেব চেকে, অন্য কোথাও দেব না।

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। অতনু আর বনশ্রী বাড়ী ফিরে এল।

অতনু যে আনন্দ নিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই আনন্দ নিয়ে ফিরতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল একটা কথা বার বার। অরিন্দম বাবু তাঁর মেয়ের ঠিকানায় নগদ পাঁচ হাজার টাক ক্যাশ দেবার জন্য কেন বললেন। তনুশ্রী তার একমাত্র মেয়ে তার বিয়ের যখন ঠিক হয়ে গেল তখন পাঁচ হাজার কেন পুরো দশ হাজারই সে আগে দিতে পাবে তবে অন্য কাকেও দেবে না।

এতদিন কেবল পাত্র খোঁজার পালাই চলছিল। এখন পাত্র ঠিক হযেছে এইবার চলল বিয়ের দিন করা পুরোহিত ডাকা, স্যাকরার বাড়ী যাওয়া আরও কত কি কাজ। অতনু বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

দুপক্ষের পুরোহিতের আলোচনায় বিয়ের দিন স্থির হল ২৩শে অগ্রহায়ণ। পাত্র পক্ষের সর্তানুযায়ী পাঁচ হাজার টাকা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে অরিন্দম বাবুকে পৌঁছে দিতে হবে। সমস্ত স্থির হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে দিন কেটে যেতে লাগল। আশ্বিন গেল, কার্তিক গেল, অগ্রহায়ণ এল। অতনু কথা মত পাঁচ হাজার টাকার একটা একাউণ্ট পেয়ী চেক নিজ হাতে অরিন্দম বাবুর হাতে পৌঁছে দিল।

অরিন্দম বাবু নগদ পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ চেয়েছিলেন। তার বদলে একাউণ্ট পেয়ী চেক দেখে প্রথমে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। অতনু ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। সে বলল— অতগুলো টাকা এভাবে আনতে আমার ভরসা হল না। যদি কিছু ঘটে যায়। তাই চেকে এনেছি। এতে অরিন্দম বাবুর কোন অসুবিধার কারণ নেই। যাক, অরিন্দম বাবু আর কথা বাড়ালেন না।

কিছুক্ষণ কথা বার্তার পর অতনু ফিরে এল। তার সারা রাস্তা মনে সন্দেহ জাগল এই অরিন্দম বাবুর ওপর। কথা মত টাকা পেয়েও লোকটা খুশী নয়। অতনুর মাথায় আসল না কেন অরিন্দম বাবু খুশী হলেন না। বাড়ীতে ফিরে এসে অতনু বনশ্রীকে, যা যা ঘটেছিল সবই জানাল। বনশ্রীও বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল অরিন্দম বাবুর ব্যবহারের কথা শুনে।

পরদিন দুপুরে এক ভদ্রমহিলা অরিন্দম বাবুর একটি চিঠি নিয়ে এসে অতনু ও বনশ্রীকে পরিচয় দিল যে সে অরিন্দম বাবুর মেয়ে, নাম নমিতা। তার কাছে চিঠি নিয়ে অতনু দেখল লেখা আছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার মেয়ে নমিতাকে পাঠালাম। আপনিত আপনার মেয়েকে শাড়ী ইত্যাদি দেবেন। আমার মেয়ে আপনাদের সঙ্গে দোকানে যেতে চায়। আপনার যদি কোন অসুবিধা বা আপত্তি না থাকে নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এখানকার সকল সমাচার শুভ। আশাকরি আপনারা কুশলে আছেন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়
অরিন্দম।

চিঠিটা পড়ে বনশ্রীকে দিয়ে অতনু বললেন—বেশ ত কেনাকাটি আমাদের করতেই হবে। তা ভালই হয়েছে। চল আমরা এক সঙ্গে যাই। তারপর সামান্য জলযোগের পর তারা সকলে এক সঙ্গে তনুশ্রীকে নিয়ে বেরল। পছন্দমত সব জিনিস কিনতে অনেক দোকান ঘুরতে হল। অনেক দেরী হয়ে গেল। নমিতা কেনাকাটির পর দোকান থেকেই চলে গেল তার বাড়ী শ্যামবাজারে, অতনু ফিরে এল তাঁর বাড়ীতে বনশ্রী আর তনুশ্রীকে নিয়ে।

অরিন্দম বাবুর সঙ্গে অতনুর কথা হয়েছিল যে বিয়ের যে দিন ঠিক হয়েছে তার দুদিন আগে একটা ভাল দিন আছে সেইদিন দুই পক্ষেরই পাকা দেখা হবে এবং বিয়ের তিনদিন আগে পঙ্কোজ কলকাতায় আসবে।

বিয়ের আর তিন দিন বাকী। ছেলে এসে পৌঁছাল কিনা অতনু জানতে পারে নি। অরিন্দম বাবু কিছুই জানান নি। বনশ্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে অতনু অরিন্দম বাবুর বাড়ীতে যাওয়ার মনস্থ করল। পাকা দেখা কিভাবে হবে সে বিষয়ে ঠিকঠাক করার জন্য আর বিলম্ব করা যায় না।

অতনু অরিন্দম বাবুর বাড়ী গিয়ে দেখল বাড়ী তালাবন্ধ। সে ভাবল হয়ত কেনাকাটার ব্যাপারে অরিন্দম বাবুরা কোথাও গিয়ে থাকবেন। পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোককে অতনু জিজ্ঞেস করল—অরিন্দম বাবুদের বাড়ীতে তালা লাগনো আছে; ওঁরা কোথায় গেছেন আপনারা বলতে পারেন?

ভদ্রলোক অতনুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—মশায়ের নাম?

অতনু—আজ্ঞে অতনু বন্দোপাধ্যায়।

নিবাস?

কলকাতায়।

অরিন্দম বাবুকে প্রয়োজন?

এত প্রশ্নে অতনু বেশ বিরক্তই হয়েছিল। তবুও বিরক্তির ভাব গোপন করে বললেন—একটু ব্যক্তিগত কারণ আছে।

"জানি না" বলে ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অতনু ভাবল লোকটা নিশ্চয় পাগল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে অন্য একটি বাড়ীর বৈঠকখানায় এক ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে অরিন্দম বাবুর বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন—ওঁরা ত শুনেছি পনের দিনের জন্য দেওঘরে বেড়াতে গেছেন।

অতনু বজ্রাহতের মত একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ভদ্রলোক অতনুকে অসুস্থ মনে করে এগিয়ে এসে বললেন—কি হল? আপনি অসুস্থ বোধ করছেন? তারপর একটা হাতপাখা নিয়ে অতনুর মাথায় বাতাস করতে লাগলেন।

অতনু একটু সামলে নিয়ে বলল—আপনি কি অরিন্দম বাবুর ছেলের বিয়ের কিছু জানেন, কবে হবে?

ভদ্রলোক—আর বলবেন না মশাই। কত জায়গায় যে উনি ছেলের বিয়ে দেবার কথা দিয়ে নগদ টাকা নিয়েছেন—তার হিসেব নেই। নগদের মোটা টাকা অগ্রিম নিয়ে ঠিক বিয়ের কিছুদিন আগে কোথায় গা ঢাকা দেন আর মেয়ের বাবারা ছুটোছুটি করে শেষে

হয়রাণ হয়ে চলে যান। এ রকম লোক মশাই দেখিনি। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে দিয়ে এমন ব্যবসা করা আমরা আর কখন দেখিনি। আর ছেলেটাই বা কি? অত লেখাপড়া শিখে এই রকম অন্যায় কাজে বাপকে সাহায্য করছে? এমন লেখাপড়া শেখার মুখে ঝাড়ুমারি মশাই। তা আপনিও কি এই ফাঁদে পা দিয়েছেন মশাই? অ্যাঁ?

তখন অতনু যা যা ঘটেছিল সমস্ত বলল।

ভদ্রলোক সমস্ত শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—কি করবেন বলুন? ছেলের বিয়ে উনি দেবেন বলে আমার মনে হয় না। তবে দেখুন আপনি চেষ্টা করে। ও লোকটি কিন্তু খুব সুবিধের নয় এটা আমি আপনাকে বলে রাখলুম। এতদূর এগোবার আগে আরও ভাল করে খবর নেওয়া উচিত ছিল আপনার। কোন ভদ্রলোক যে এতবড় ঠগ হতে পারে এ ধারণা সাধারণ লোক করবেই বা কি করে।

অতনু ভদ্রলোককে নমস্কার করে বললেন—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি আজ আসি। তারপর সেই ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল—আচ্ছা আর একবার ২২শে ফাল্গুন সকালে আসব। এত সহজে ছাড়ব না। বড় কষ্টের উপার্জনের পাঁচ হাজার টাকা এত সহজে অরিন্দম বাবুকে হজম করতে দেব না। আমিও দেখব কি করা যায়।

বনশ্রী অতনুর ফেরবার জন্য অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছিল। অতনুকে বিরস বদনে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে অজানা আশঙ্কায় তার মন দুলে উঠল। সে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাস করল—হ্যাঁ গো কি বললে কথা পাকা হল?

ঘাড় নেড়ে অতনু বাইরের ঘরের তক্তাপোশের ওপর হতাশ হয়ে বসে পড়ে বলল—বনশ্রী সবই ভুয়ো, সবই মিথ্যে। ওঃ এত বড় জালিয়াত?

বনশ্রী অবাক হয়ে বলল—কি ভুয়ো? কি মিথ্যে? কে জালিয়াত? কি বলছ কি?

অতনু তখন যা যা ঘটেছিল সমস্ত বনশ্রীকে বলে আফশোষ করে উঠল—এই ঘটনার পর তনুর মনে কি আঘাত লাগবে বলত ? ওঃ এত বড় স্কাউঁণ্ড্রেল ! আগে একটু আভাষও দেয়নি ! নাঃ আমারই ভুল ; যখন নগদের টাকাটা ক্যাশ টাকায় চেয়েছিল তখনই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আর একবার ব্যাঙ্কে খবর নিয়ে দেখি চেকটা ভাঙ্গিয়েছে কিনা।

বনশ্রী—এখন উপায় ? আমাদের ত সমস্ত কার্ডই প্রায় বিলি হয়ে গেছে। কি অপদস্থ হতে হবে বলত ? লজ্জার কথা ! লোকে কি বলবে বলত ?

অতনু—আমি ঠিক করেছি যে ২২শে তারিখে একবার শেষ চেষ্টা করব। যদি সেদিনও দেখি ওরা ফেরেনি তাহলে বুঝব যে সব মিথ্যে আর আজই সব জায়গায় খবর পাঠাচ্ছি যে বিশেষ কারণে বিয়ে স্থগিত রইল। যারা খবর না পেয়ে আসবে তাদের বুঝিয়ে বলব। কেউ কিছু মনে করবে না।

বিয়ে বাড়ীর আনন্দ একটা নিরানন্দময় আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হল।

অনেক ভেবে চিন্তে অতনু ২২ তারিখের সন্ধ্যা বেলায় অরিন্দম বাবুর বাড়ী গিয়ে দেখল, সেই বাড়ীর সদরে আগেকার মতই তালা ঝুলছে। অতনু ঠিক এই রকমই মনে মনে ধারণা করেছিল। সে একটুও আশ্চর্য হল না। ধীরে ধীরে সেই পূর্বের পরিচিত ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে গিয়ে বসল।

ভদ্রলোক ঘরেই ছিলেন। অতনুকে দেখে চিনতে পারলেন। নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলেন—কোন কিনারা হল ?

"না, আজও দেখছি তালা লাগান আছে।

"আমি ত আপনাকে বলেছি যে ওরা পনের দিনের জন্যে দেওঘরে যাচ্ছে বলে গেছে। আপনি ওদের আশা ছাড়ুন। এতবড় জালিয়াত আজকালকার বাজারে পাওয়া যাবে না। এত সহজে ছাড়বেন না মশাই। যেমন করে হোক টাকা ফেরত পাবার ব্যবস্থা করুন। কত-

লোকই ত আজ পর্যন্ত ঠকল! কিন্তু কেউই ভয়ে কোন কিছু করতে চায় না। আপনি মশাই অত সহজে ছাড়বেন না। যখন ওরা পনর-দিন দেওঘরে যাবার কথা বলেছে তখনই আমি বাড়ীতে বলেছি যে আবার কাকে পথে বসাল।

"আচ্ছা দেখি" বলে অতনু নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

এর পরে অতনু লোক মারফৎ রোজই খবর নেয় অরিন্দম বাবুরা ফিরেছেন কিনা। খবর পায় যে না তাঁরা তখনও ফেরেন নি।

অতনু আর বনশ্রী রোজ কি পরামর্শ করে। মাঝে মাঝে আজকাল অতনুর পিসতুতো ভাই শৈলও আসে অতনুর বাড়ীতে। অতি সাধারণ ভাবে দিন কাটতে থাকে।

মধ্যপ্রদেশ সরকারের সহযোগীতায় যে "কেমিক্যাল ও ফারমাসিউটি-ক্যাল" সংস্থাটি গড়েছে তার বিরাট পাঁচীল দিয়ে ঘেরা এলাকার দক্ষিণ দিকে এই সংস্থার যত অফিসারদের কোয়ার্টার। এই সংস্থার যিনি সর্বাধ্যক্ষ শ্রীবিনায়ক চট্টোপাধ্যায় একজন কৃতী আই. এ. এস. অফিসার। তাঁর একমাত্র ছেলে শ্রীবিধায়ক চট্টোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশের আই. পি. এস অফিসার। বয়স সাতাশ বছর। শৈলর চেষ্টায় বিধায়কের সঙ্গে তনুশ্রীর বিয়ের পাকাপাকি হয়ে গেল। বিয়ে হবে শৈলদের বাড়ী বাগনান থেকে।

বিনায়ক বাবু অতি অমায়িক লোক। তাঁর পক্ষে বাগনানও যা কলকাতাও তা। শৈল বিনায়ক বাবুকে বললে—আপনার কোন অসুবিধে হবে না। আপনারা যতজন আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের থাকার আলাদা ব্যবস্থা করব। আপনাদের থাকবার কোন অসুবিধে হবে না।

বিনায়ক বাবু বললেন—আমরা বার থেকে পনরজন ২৪শে ফাল্গুন বাগনানে যাব। ২৫শে পাকাদেখা আর ২৭এ বিয়ে। ২৯শে ফাল্গুন আমরা বাগনান থেকে ফিরব। এই ভাবেই আমি ট্রেনে রিজার্ভেশন করব।

কথা একেবারে পাকা করে শৈলকে সঙ্গে করে অতনু ফিরে এল।

বিয়ের যেদিন ঠিক হল সেদিন দুটো লগ্ন আছে, একটা গোধূলি লগ্নে আর একটা গভীর রাত্রে।

২৪শে বিনায়ক বাবু সদলবলে বাগনানে এসে পৌঁছালে ২৫ তারিখে বেশ সুষ্ঠুভাবে দুই পক্ষের পাকাদেখা হয়ে গেল। শৈলদেব বাগনানের বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। আত্মীয়, স্বজন, অতিথি অভ্যাগতদের ভীড়ে বাড়ী জম জমাট। অবশেষে এল ২৭এ ফাল্গুন। হৈ, চৈ, ব্যাপার। ঘন ঘন উলুধ্বনি আর সানাইএর বাজনা চারিদিকে সরগরম করে রেখেছে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই বিয়ের লগ্ন। বিয়ে হয়ে গেল। বর কনে বাসর ঘরে গেছে। লোকজন খাওয়ান আরম্ভ হয়ে গেছে। এক বিরাট আয়োজন হয়েছে। দু হাজার লোকের ব্যবস্থা। শৈল চারিদিকে দেখা শোনা করছে। বরযাত্রীরা খুব সন্তুষ্ট শৈল এবং অতনুর ব্যবহারে। দু ব্যাচ্ নিমন্ত্রিতরা খাওয়া সেরে অধিকাংশ চলে গেছেন। তাঁদের মধ্যে দু চারজন যাই যাই করে তখনও যান নি। চেনা পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। তৃতীয় ব্যাচ্ খেতে বসেছে। এমন সময় বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। আর এক বর এসেছে বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে।

সকলে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। কেউ বলছে ভুল করে অন্য বর এসেছে। কেউ বলছে বরকে নামাও। শৈল আগে গিয়ে বরকে নামিয়ে আনল।

অতনু কিছু বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কি। সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সকলেরই একই অবস্থা। বরকে ঘরে বসিয়ে শৈল ফিরে এল। অরিন্দমবাবু তখন বারান্দায় একটি কৌচে হেলান দিয়ে বসে হাতে সিগারেট নিয়ে সুখটান দিচ্ছেন। শৈল বললে—অরিন্দমবাবু তনুশ্রী স্বয়ম্বরা হবে বলে জানিয়েছে। আরও একজন বর এসেছেন। তনুশ্রী যার গলায় মালা দেবে তাকেই আমরা বর বলে মেনে নেব।

পাশাপাশি দুটো গদি দেওয়া চেয়ার রেখে গেল দুজন কর্মচারী।

একটাতে পঙ্কোজকে নিয়ে বসাল শৈল আর অন্যটায় নিয়ে বসাল বিধায়ককে। এইবার শৈল হাতজোড় করে বললে—দেব, দ্বিজ সাক্ষী, আমাদের একটিই মেয়ে কিন্তু প্রার্থী দুজন। কেউ কিছু মনে করবেন না। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি মেয়েকে আনছি।

নিমন্ত্রিতেরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। একি তাজ্জব ব্যাপার। এতো কখন কেউ দেখেনি!

শৈলর ডাকে তনুশ্রী একটা গোড়ে মালা নিয়ে শৈলর পাশাপাশি এসে দাঁড়াল। তারপর উপস্থিত সকলকে নমস্কার করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বিধায়কের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

আগের থেকে শেখান মত খুব জোরে উলুধ্বনি উঠল বাড়ীর ভেতর থেকে। শাঁখ বেজে উঠল জোড়ায় জোড়ায়। বিধায়ক আর তনুশ্রী গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় বাসর ঘরে চলে গেল।

অরিন্দমবাবু প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেন নি। এইবার গুরুত্ব বুঝতে পেরে চিৎকার করে বললেন—একি পাগলামা হচ্ছে? এইভাবে অপমান বাড়ীতে ডেকে এনে? এইভাবে জুয়াচুরী? ভজা, ভজা, আয় একবার এদিকে।

শৈল বললে—অরিন্দমবাবু, অনর্থক চিৎকার করে ভজাকে ডেকে কি হবে, সে আর সাড়া দেবে না।

অরিন্দম—অ্যা! ভজা নেই? ভজা নে......ই?

শৈল—না অরিন্দমবাবু, ভজা বহাল তবিয়তেই আছে, তবে সে আপনার হয়ে আর অন্যায় করবে না। আর জুয়াচুরীর কথা বলছেন? দেখুনত এদের চিনতে পারেন কি না!

তাদের দেখে অরিন্দমবাবুর গলার স্বর যেন আটকে আসতে চাইল। তিনি বার-দুই কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন—আপনারা এখানে? কি করে এলেন এখানে অ্যা?

তাঁরা দুজনেই বললেন—আমাদের যে আপনি চিনতে পেরেছেন এতেই আমরা কৃতার্থ। এইবার আমাদের কাছ থেকে আপনি যে

টাকা নিয়েছেন সেটা ভালয় ভালয় দিয়ে দিন তা না হলে আপনাদের জন্যে আরও বেশী আপ্যায়নের ব্যবস্থা করব।

বিনায়কবাবু একটু বিশ্রাম করছিলেন। বাড়ীতে চেঁচামেচি শুনে তিনি বেরিয়ে এলেন! এত কাণ্ড তিনি কিছুই জানেন না। শৈলকে সামনে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার শৈলবাবু?

তখন শৈল বলল—দেখুন মিঃ চ্যাটার্জি আজ আপনাদের আমি একটা মজার ঘটনার কথা বলব। আপনারা খুব মজা পাবেন। যাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল এবং তখনও চলে যান নি তাঁরা সেখানে ভীড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যাঁরা তখনও খাওয়া শেষ করতে পারেন নি তাঁরা তরকারী ও দই মাখা হাতে বসে আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগলেন।

শৈল বলে চলল অরিন্দমবাবুকে দেখিয়ে—এই ভদ্রলোক শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায় একজন বেশ কৃতী সন্তান।

অরিন্দম—বাড়ীতে ডেকে এরকম অপমান? চল পঙ্কোজ—বলে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই দুই ভদ্রলোক যাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল তাঁরা এগিয়ে এসে বললেন—আহা চটছেন কেন? কোথায় যাবেন এই অসময়? বিশেষ করে এমন মজার নাটকটা সবে জমে উঠেছে।

অরিন্দমবাবু রাগে গরগর করতে করতে বসে পড়লেন। একরকম ক্লান্ত হয়েই কোচে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন।

শৈল আবার আরম্ভ করল—অরিন্দম বাবুর পুত্র শ্রীমান পঙ্কোজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ শাস্ত্রের পি. এইচ. ডি এবং একটি সরকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অরিন্দম বাবু তাঁর ছেলের বিয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে কথা পাকা করেন আর প্রত্যেক কন্যাদায়গ্রস্থ বাপের কাছ থেকে বেশ মোটা যৌতুক হিসেবে অগ্রিম আদায় করেন। তারপর বিয়ের যখন ঠিক ঠাক তখন উনি সস্ত্রীক বাড়ী তালা বন্ধ করে হয় দেওঘর, নয় মধুপুর, নয়ত ঘাটশীলা বা পুরীতে কিছুদিনের জন্য হাওয়া বদলাতে চলে যান।

আপনারা সহজেই কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার অবস্থা বুঝতে পারেন। আত্মীয়, স্বজন ও পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে সেই অসহায় মেয়ের বাপ তখন সমাজের কলঙ্ক ও অপমান থেকে বাঁচবার জন্য হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে থাকে।

পরে যখন অনেক কষ্টে অরিন্দম বাবুর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় তখন তিনি ছেলেব বিবাহের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ত বটেই সেই সঙ্গে অগ্রিম নেওয়া যৌতুকের কথাও অস্বীকার করেন। কন্যাপক্ষ বেশী পীড়াপিড়ি করলে তিনি তাঁর এই অসৎ কাজের সহায়রূপে ভজা ও তার দলকে লাগিয়ে দেন মেয়ের বাপেব পেছনে। এই কাজ তিনি নির্বিঘ্নে করে আসছেন। তিনি আইন আদালত মানেন না; কারুকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁর একমাত্র সহায় ভজা। আপনাদের কাছে এই ভাজারও একটু ইতিহাস বলা দরকার। ভজা বাবু ওরফে ভজহরি দাস একটা ডাকাতি কেসে পাঁচ বছর জেল খেটেছেন। তিনি অনেক রাহাজানি করেছেন আর দল গড়ে তুলেছেন এবং এখন তিনি অরিন্দম বাবুর বিশেষ অনুগত।

এখন আসল কথায় আসা যাক। অতনু আমার মামাত ভাই। তনুশ্রীর বিয়ে অরিন্দম বাবুর ছেলে শ্রীমান পঙ্কোজের সঙ্গে হবার ঠিক হয় এবং অতনুর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা যৌতুক দাবী করেন। সেই দাবীর অর্দ্ধেক অর্থাৎ পাঁচ হাজার অগ্রিম নেন এবং তাঁর চিরা-চরিত স্বভাব মত বিয়েব যখন সব ঠিকঠাক, বিয়ের ৩।৪ দিন আগে তিনি বাড়ীর দরজায় তালা লাগিয়ে দেওঘরে গিয়ে উঠলেন। অতনু পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি আগে জানতে পারিনি ব্যাপারটা কি। অবশ্য জানতে পারলেও বিশেষ কিছু করতে পারতুম বলে মনে হয় না। যখন জানতে পারলুম তখন বিয়ে স্থগিত হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করে অতনুকে নিয়ে অরিন্দম বাবুর কাছে উপস্থিত হলুম। অতনুকে তিনি আগে কোন দিন দেখেছেন বলে মনে হল না। বিয়ের প্রস্তাবেব কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বললেন —আমার ছেলের বিয়ে? বলছেন কি?

অতনু তখন বললে যে সে যৌতুকের অর্ধেক পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়েছে উনিত চটেই আগুন। বললেন—অগ্রিম কিসের মশাই? আমার কাছে উনি ধার নিয়েছিলেন আর সেইটেই শোধ দিয়েছেন। এখানে অগ্রিমের কথাই বা কোথায় আসছে আর ছেলের বিয়ের কথাই বা কোথায়? যান মশাই আর ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করবেন না, বিশেষ সুবিধে হবে না। আমি আপনাদের সঙ্গে আর কোন আলোচনা করতে চাই না। আপনারা আসতে পারেন। এই বলে অরিন্দম বাবু উঠে চলে গেলেন ভেতরে। আমি আর অতনু বোকার মতন খানিকক্ষণ বসে থেকে চলে এলুম!

এর কিছুদিন পরে আবার একদিন অতনুকে নিয়ে আমি অরিন্দম বাবুর কাছে যাই। সেদিন অরিন্দম বাবু আমাদের বসালেন তারপর কাকে যেন ইশারা করলেন। দশ মিনিটের মধ্যে ভজা তার দল নিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলল। তাদের দলের কার কার হাতে ছোরা। ভজা আমাদের ভাল করে শাসিয়ে দিল যেন আমরা ভদ্রলোককে অযথা হয়রানি না করি। তারপর আমাদের একরকম পাড়ার বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। সেই সময় আমাদের পেছনে অরিন্দম বাবুর চাপা হাসি শুনতে পেলুম। তিনি চেঁচিয়ে ভজাকে বললেন—ভজা, কুটুম্বদের বেশ ইজ্জতের সঙ্গে নিয়ে যা। ভজার দল আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময় ভজা তার হাতের ছোরাটা আমার মুখের কাছে অহেতুক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, শেষ বার বলে দিচ্ছি আর এদিকে আসবার চেষ্টা করো না। একেবারে মেরে লাস গুম করে দেব। পুলিশে খবর দিয়ে কিছু হবে না। পুলিশও আমাদের ভয় করে চলে, হ্যাঁ।

আমরা অপরাধীর মত মাথা নীচু করে চলে এলুম। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে মাটিতে মিশে গেলুম। এখনও সমাজে এই রকম ভদ্রবেশী ঠগ, জুয়াচোর আমাদের দেশে আছে। ভজার কি দোষ! এই রকম হাজার ভজা তৈরী হচ্ছে অরিন্দম বাবুর মত ভদ্রলোকের মুখোস পরা অভদ্রলোকদের সহায়তায়। তখন আমার মনে হয়েছিল যেমন করে

হোক এ অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে।

অতনুর অনিচ্ছা সত্বেও আমি তাকে নিয়ে থানায় যাই। কোন ফল হল না। এস্ পি কে জানালুম। তিনি থানাকে বলে দিলেন। কোন কিছুই হল না। উল্টে কয়েকখানা বেনামী চিঠি এল অনেক ভয় দেখিয়ে লেখা।

শেষে ঈশ্বর প্রেরিত একটা উপায় এল। বিধায়কের সন্ধান পাওয়া গেল। ছেলে মেয়ে দেখা দেখি সবই হল নাগপুর থেকে যেখানে বিধায়কের পোস্টিং।

অবশেষে কথা পাকাপাকি এবং কোথা থেকে বিয়ে হবে এসব বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করার জন্যে আপনার বাংলোয় যাই মধ্য প্রদেশে।

শ্রীমান পঙ্কোজ যে আপনার ওখানেই কাজ করে আর তার কোয়ার্টার যে একই জায়গায় তা আমরা জানতুম না। পঙ্কোজ আমাদের ওখানে যাওয়া আসা লক্ষ্য করেছিল এবং ওর বোধহয় ধারণা হয়েছিল যে আমরা আপনার কাছে ওর বিরুদ্ধে নালিশ করতে গিয়েছি। অতনুকে দেখে পঙ্কোজ চিনতে পেরেছিল। আমরা যখন আপনার ওখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি তখন সে আমাদের যাবার পথে এসে নমস্কার করে অতনুকে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কি মনে করে?

অতনু জবাব দেয় চ্যাটার্জি সাহেবের কাছে গিয়েছিলুম একটা দরকারে। চ্যাটার্জি সাহেবের নাম শুনেই পঙ্কোজ যেন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—আমি বাবাকে লিখেছি বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার জন্যে। আপনারা চ্যাটার্জি সাহেবকে এ বিষয়ে কিছু বলবেন না। সামনের যে বিয়ের তারিখ আছে সেই তারিখেই বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

আমি পঙ্কোজকে আগে কখন দেখিনি। আমি অতনুকে জিজ্ঞেস করলুম—অতনু ইনি কে?

অতনু বললে—উনি অরিন্দম বাবুর ছেলে পঙ্কোজ, যার সঙ্গে তনুশ্রীর বিয়ের ঠিক হয়।

তখন আমি পঙ্কোজকে জিজ্ঞেস করি—যদি অরিন্দম বাবু রাজী

না হন ?

পঙ্কোজ উত্তরে বলেছিল—সে ভার আমার। আপনারা আমাকে বিয়ের দিন জানান।

আমি তার মিনতি ও আগ্রহ দেখে বলি—আচ্ছা আজ রাত্রে জানাব।—

তারপর অতনুর সঙ্গে আমি আমাদের আস্তানা রেস্ট হাউসে ফিরে পাঁজি দেখি আর একটা দুষ্টু বুদ্ধি আমার মাথায় আসে। আজ বিয়ের দুটো লগ্ন ছিল; একটা সন্ধ্যায় যাতে তনুশ্রীর বিয়ে হল আর একটা রাত বারটার পর। আমি এই কুলাঙ্গার অরিন্দম বাবুকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে আজ এই দ্বিতীয় লগ্নে নকল বিয়ের ব্যবস্থা করি। ঐ দিন সন্ধ্যায় আমি একলা গিয়ে পঙ্কোজকে জানিয়ে আসি যে দ্বিতীয় লগ্নে আজ বিয়ে। যদিও কার্ডে অতনুর ঠিকানা ছাপা থাকবে বিয়ে কিন্তু আমার এই ঠিকানায় হবে। এই বলে আমি এই ঠিকানাটা ভাল ভাবে লিখে দিয়ে আসি।

আজ এই বিয়ের অভিনয়ের আমি ব্যবস্থা করেছি। ভজার আমি অতি উত্তম ব্যবস্থা করেছি। সে দুটো খুনের কেসে ফেরারী। এখন সে বেশ ইজ্জতের সঙ্গে থানা হাজতে আছে আর অরিন্দম বাবুর মুণ্ডপাত করছে।

মিঃ চ্যাটার্জি অতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলেন। এইবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে খানিকটা হাসলেন তারপর বললেন—কই দেখি নকল বরকে। সে কি সত্যিই আমাদের পঙ্কোজ ?

পাশের ঘর থেকে পঙ্কোজকে আনা হল। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দিকে চেয়ে মিঃ চ্যাটার্জি বললেন—পঙ্কোজ যা শুনলুম এ সব কি সত্যি ?

মাথা নীচু করেই পঙ্কোজ ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ সত্যি।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন—সত্যি ? ছিঃ ছিঃ পঙ্কোজ তুমি না উচ্চ-শিক্ষিত! এই কি তোমার শিক্ষার নিদর্শন ? লজ্জার কথা। আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে যাদের যাদের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে টাকা

নেওয়া হয়েছে যদি সমস্ত ফেরত না দেওয়া হয় আমি তোমার বিরুদ্ধে সরকারের কাছে লিখতে বাধ্য হব। আমাকে তুমি সাতদিন পরে জানাবে সমস্ত ফেরত হয়েছে কিনা।

পঙ্কোজ "অল রাইট স্যার" বলে ধীর পদক্ষেপে ঘরের এককোণে গিয়ে বসল মাথায় একটা হাত রেখে।

অরিন্দম বাবু আর ঘরে যেতে পারলেন না সেইখানেই বসে রইলেন। এতবড় অপমান বোধ হয় তাঁর কল্পনার বাইরে। যদি কলিযুগ না হত তাহলে তিনি ধরনীকে দ্বিধা হয়ে তাঁকে এই অপমান থেকে রক্ষা করে বুকে আশ্রয় দিতে অনুরোধ করতেন।

কৌশল

নীরেণ রায় কো-অপারেটিভ ইনস্‌পেক্টর। তাকে মাসের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক দিনই বাইরে থাকতে হয় টুরে। সংসারে সে, তার স্ত্রী স্নিগ্ধা আর একটি ছয় বছরের মেয়ে রিণা। নীরেণের বিধবা মা ছিলেন নীরেণের প্রধান আশ্রয়। তিনি ছিলেন তার অভিভাবক সে যেখানেই থাক না কেন, তার মনে ছিল শান্তি যে বাড়ীতে মা আছেন। তার ভাবনার কোন কারণ ছিল না। কখন কখন মফস্বলে তার এক নাগাড়ে পাঁচ সাতদিন থাকতে হত। বাড়ীতে বাজার হাট করার জন্যে ছিল একটা ছোকরা চাকর। দোকান বাজার ফাই ফরমাস সেই খাটত। রান্না বান্না স্নিগ্ধা নিজ হাতে করত। রিণা থাকত তার দিদুর কাছে। নীরেণ থাকত মহা আনন্দে কাজে ভুলে। মা আর স্নিগ্ধার হাতে সংসার খরচ বুঝিয়ে দিয়ে সে মহাসুখে ও শান্তিতে সময় কাটাত। নীরেণের সহকর্মীদের ভেতরে অনেকে তার এই সুখ ও শান্তিতে ঈর্ষান্বিত ছিল আর অনেকে তাকে ভাগ্যবান বলে তার শুভ কামনা করত।

ভগবানের রাজত্বে নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি কারও ভাগ্যে থাকতে পারে না। সেখানে দুঃখ, অশান্তি প্রভৃতিরও ভাগীদার সকলকে হতে হবে, এইটাই বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রায়। তাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে একদিন নীরেণ কেও সেই দুঃখ এবং অশান্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে হল। মাত্র দুদিনের সামান্য জ্বর ভোগ করে নীরেণের মা কারুকে বুঝতে না দিয়ে একদিন পরলোক গমন করলেন।

মাতৃবিয়োগ অত্যন্ত দুঃখের। নীরেণের কাছে এটা একটা ভীষণ আঘাত হয়ে বাজল। এখন আর সে নিশ্চিন্তে বেশীদিন বাইরে থাকতে পারে না। সব সময় তার মন পড়ে থাকে বাড়ীতে। সব সময় সে চিন্তিত থাকে স্নিগ্ধা আর রিণার জন্যে। প্রথম প্রথম সে ভাবল যে ধীরে ধীরে সে চিন্তা থেকে মনকে সংযত করতে পারবে কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল তার মন আরও বেশী চিন্তায় বিক্ষুব্ধ হতে লাগল।

যখনই বাইরে টুরে যেত তার প্রতিবেশী অশোক রায় ও তার স্ত্রী অনিন্দিতা দেবীকে অনুরোধ করে যেত যেন তার অনুপস্থিতে প্রয়োজন হলে তাঁরা দুজনে স্নিগ্ধা ও রিণাকে সাহায্য করেন। বলা বাহুল্য, অশোকবাবু ও তার স্ত্রী তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তার কোন ভাবনা নেই। তাঁরা সব সময় তাদের খোঁজ খবর নেবেন।

এই ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল ভাল করে। বাইরে টুরে যাবার সময় নারেণের মনে এখন আর দুশ্চিন্তা থাকেনা আগের মত। স্নিগ্ধা নিজেও বেশ চৌখস। কোন অসুবিধে আর তাদের হল না এবং ধীরে ধীরে মায়ের অভাবটা নীরেণ ভুলে গেল।

এইবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। নীরেণের বদলির হুকুম হল। এবার তার বদলি হল অনেক দূরের এক গ্রামে। একেত এই পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে হবে তার ওপর আর এক ফ্যাসাদ হল ছোকরা চাকরটাকে নিয়ে। তার মা, বাবা, তাকে এত দূরে ছাড়তে রাজী নয়। নীরেণ তার মাইনে দুটাকা বাড়িয়ে দিতে চাইল। তাতে তারা রাজী হল না। নীরেণ পাঁচ টাকা পর্যন্ত মাইনে বাড়াতে চাইল কিন্তু তার মা আর বাবা সেই এক কথা বলতে রইল—না বাবু, তুমি মাইনে বাড়াও আর না বাড়াও, আমরা ছেলেকে এতদূরে ছেড়ে থাকতে পারব না। মরার সময় ছেলের হাতের একটু জলও পাব না—না বাবা, সে আমরা পারব না।

অগত্যা চাকরকে সঙ্গে নেবার বাসনা নীরেণকে ছাড়তে হল। নীরেণ বিরক্ত হয়ে স্নিগ্ধাকে বলল—ছোটলোকের খোসামোদ আর করব না। এখানে থেকে ওর বাবা আর মার মুখে ভাল করে ঠাণ্ডা জল দিক।

এরপর চলল জিনিস পত্র বাঁধাবাধি। কিছুনা কিছুনা করেও মালপত্র নেহাত কম হল না। সব জিনিসই প্রয়োজনীয়। ঝাঁটা থেকে আরম্ভ করে শীল, নোড়া, মশলার কৌটো কিছুই ফেলবার নয়। নীরেণ যেটা বাদ দিতে চায় স্নিগ্ধা সে জিনিসের প্রয়োজনীয়তা বোঝায়। এই ভাবে এক গরুর গাড়ী মাল হল। সব ঠিকটাক করে জয়েনিং

টাইম তিন দিন থাকতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে নীরেণ স্নিগ্ধা আর রিণাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রিণা ছোট মেয়ে। তার মনে আর আনন্দ ধরে না। রেলে চড়ে সে অনেক দূরে যাবে তারপর গরুর গাড়া, কি মজাই না হবে। বাড়ীর সামনে তার বন্ধু বাণী আর কমলাকে সে বড় বড় চোখ করে সব বলতে লাগল। তার পরে ছুটে এসে বাবার হাত ধরে গরবে গরবে পা ফেলে চলতে রইল। বন্ধুরা তার দিকে চেয়ে রইল। যতদূর দেখা যায় রিণা ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

আজ নীরেণের সব চেয়ে বেশী করে মনে পড়তে লাগল তার মার কথা। মা বেঁচে থাকলে আজ আর তাকে কোণ ভাবনাই ভাবতে হত না। তার ওপর তার চাকরটাও আজ সঙ্গে যাচ্ছে না। নতুন জায়গা, কে জানে কতদিনে একটা বিশ্বাসী লোক পাওয়া যাবে। নীরেণ অবশ্য যার জায়গায় বদলী হয়ে যাচ্ছে তাকে আগে থেকেই একজন কাজ করার লোকের কথা চিঠিতে লিখেছে কিন্তু চিঠির কোন জবাব পায় নি। তাই তার মনে অনেক রকম চিন্তা একসঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে। সে অনেক চেষ্টা করেও জট খুলতে পারে নি।

যখন নীরেণ, স্নিগ্ধা ও রিণাকে নিয়ে একটা 'ছই' লাগান গরুর গাড়ীতে উঠে বসল তখন বেলা দুটো। গাড়োয়ানের কাছে জানতে পারল যে তার গন্তব্যস্থল সেখান হতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অর্থাৎ দশ মাইল। পাড়াগাঁয়ে দূরত্বের সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। পাঁচ ক্রোশ মানে পাঁচ ক্রোশও হতে পারে আবার সাত ক্রোশও হতে পারে। মাঠের ওপর দিয়ে যেতে হবে। ধান কাটবার পর ক্ষেতের আল্ কেটে গরুর গাড়ী যাবার মত রাস্তা করা আছে। গরুর গাড়ীর চাকার লিক ধরে ধরে গাড়ী চলতে রইল। গাড়ীতে বেশ মোটা করে খড় বিছান আছে। তার ওপর চাদর পেতে শোবার উপযুক্ত করে নিল নীরেণ। রিণাকে সামনের দিকে বসিয়ে দিল নীরেণ যাতে ঝাকানি কম লাগে।

গরুর গাড়ী প্রথমে কিছুটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলতে রইল। একে

বারে অজ পাড়া গাঁ। এখানে মোটর গাড়ীত নেই-ই, এমন কি সাইকেল রিক্সাও নেই। গ্রামের লোকরা বড় গরীব। পাঁচ, সাত ক্রোশ রাস্তা ওরা অনায়াসে হেঁটে যাতায়াত করে। হাটে যেতে হলে তাদের ছয় ক্রোশ রাস্তা যেতে হয় আবার সেই রাস্তা ফিরে আসতে হয়। এখানে গরুর গাড়ী চড়ে যাবার মধ্যে এক নায়েববাবু মাঝে মাঝে যান আর সরকারী আমলারা যখন আসেন তখন যান।

নীরেণদের গরুর গাড়ী যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন দুধারে ছেলে, বুড়ো সেই দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। মেয়েরা, যারা ঘাটে জল নিতে এসেছিল তারা বড় ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকে জানবার জন্যে কে যায় গরুর গাড়ী চড়ে।

একজন বুড়ো মত লোক হাতে লাঠি নিয়ে চলছিল। সে গাড়োয়ান কে উদ্দেশ করে বললে "ও সম্বন্ধার পো, কে যায় গো গাড়ীতে?

গাড়োয়ান বললে—করপুটে ইনসপেকটর গো।

বুড়ো—ওঃ পেরনাম বাবু, তাই বলি কে যায় গো গাড়ীতে আমার নাম বিরাট মণ্ডল গো, আমি যাব আপনার ওখানে কালকে' এই বলে বুড়ো হাতটা তুলে কপালে ঠেকাল।

নারেণ প্রতি নমস্কার করে বললে—আচ্ছা কত্তা যেও।

গাড়ী এগিয়ে চলতে লাগল। রাস্তায় লোকজন বড় কম চলাচল করছে। নীরেন জিজ্ঞেস করলে গাড়োয়ানকে—এত ফাঁকা কেন? লোক জন খুব কম মনে হয়। এ গ্রামে লোক বেশী নেই?

গাড়োয়ান—বাবু গ্রামে আর লোক কোথায় পাবেন। সবইত গেছে কারখানার কাজে। ঐখানেই থাকে খায় আর সপ্তায় সপ্তায় আসে বাড়ীতে।

নীরেণ—কিসের কারখানা?

গাড়ো—ঐ যে গো কি যে বলে রবাটের কারখানা গো, এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে। জোয়ান মরদগুলো সব গেল কারখানায়। ক্ষেত খামারের কি হাল হয়েছে দেখ। লোক জন নেই সব আগাছায় ভরে গেছে। বলি ক্ষেত খামারের কাজে আমাদের বাপ চোদ্দ পুরুষের

কাটল আজ বাবুদের নাকি পোষাচ্ছে না তেনাদের বাঁধা আয় চাই। এ করলে কি চ'লে ? বাবু তুমিই বল না কেন ?

নীরেণ মনে মনে ভাবতে রইল কি বলবে। দেশ এখন কৃষির চেয়েও কলকারখানার দিকে বেশী নজর দিয়েছে তবে কৃষিকে অবহেলা করে কতটা উন্নতি করতে পারবে সে বিষয়ে নীরেণেরও সন্দেহ যে নেই তা নয় তবে এ বিষয়ে সে কোন মন্তব্য করতে চাইল না। গাড়োয়ান নিজের মনেই বকতে রইল—পাঁচ বিঘে ধানজমি আমার এ বছরে জুততে পারলুম না। তিন ছেলে তিন জনেই কারখানায় গেছে। আরে শুনতেই একশ বিশ টাকা মাইনে। এইত ছমাস গিয়েছিস আমাকে কি সাহায্য করতে পেরেছিস ? নাঃ সবই অদেষ্ট বাবু। সবই অদেষ্ট।

এই সময় একটা নীলকণ্ঠ পাখী ডান দিকের একটা খেঁজুর গাছ থেকে উড়ে বাঁ দিকের একটা গাছের নীচের ডালে গিয়ে বসল। রিণা চেঁচিয়ে উঠল, বাবা ঐ দেখে কি সুন্দর পাখী, কি পাখী বাবা ?

নীরেণ বলল—ওর নাম নীলকণ্ঠ। ফাঁকা মাঠের ধারে গাছে ঐ পাখী খুব দেখতে পাওয়া যায়। ট্রেনে যেতেও অনেক দেখা যায়।

রিণা পাড়াগাঁয়ে জ্ঞান হবার পর যায় নি। সে যে পাখী দেখে তাতেই তার আনন্দ। একটা ফিঙ্গে এসে উঠে বসল একটা গাছের সব চেয়ে নীচের ডালে। রিণা হাত তালি দিয়ে উঠল। নীরেণ বলল এটা হল ফিঙ্গে। রিণা যা দেখে তার মানে জানতে চেষ্টা করে। চলতে চলতে একটা খেজুর গাছে একটা হাড়ি ঝোলান দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল—বাবা, কে গাছে একটা কি ঝুলিয়ে রেখেছে, ঐ দেখ। নীরেণ তাকে বোঝায় ঐ ভাবে খেজুর রস হাড়িতে ভরা হয় তার পর সেই রস জ্বাল দিয়ে গুড় হয়। নীরেণ বললে একদিন সে খেজুর রস খাওয়াবে, কি সুন্দর মিষ্টি খেতে।

এই ভাবে চলতে চলতে গাড়ীর দোলাতে রিণা, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক সকালে উঠেছে আর জেগে থাকতে পারল না। স্নিগ্ধাও ছইয়ের ধারে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। নীরেণ সহরের মানুষ। সে

অবশ্য তার চাকরীর জন্যে অনেকবার পল্লীঅঞ্চলে ঘুরেছে কিন্তু স্নিগ্ধা কখনও গ্রামাঞ্চলে যায় নি। তার কাছে এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি।

যখন গরুর গাড়ী তার গন্তব্য স্থলে পৌঁছাল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। এই আবছা অন্ধকারে ভাল করে কিছুই বোঝা যায় না। কো-অপারেটিভ ব্রাঞ্চের একজন পিওন একটা বহুদিনের জঙ্গ ধরা হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে ঐখানে অপেক্ষা করছিল। সেই হ্যারিকেনের ভুসো পড়া কাঁচের আলোয় আগে আগে পিওন, তার পেছনে নীরেণ আর সবশেষে স্নিগ্ধা রিণাকে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল। পিওনকে জিজ্ঞেস করে নীরেণ জানতে পারল তার নাম হরিহর।

বাড়ীটার দেয়াল সমস্তটাই ইটের তৈরী। ওপরের ছাদটা চার চালা খড়ের। হরিহর বললে যে সে এখানে আছে আজ প্রায় দশ বছর। এই দশ বছরে তেরজন ইনসপেকটর এই জায়গায় এসেছেন আর গেছেন। তাঁরা সকলেই হরিহরকে খুব ভাল বাসতেন। সে এখান থেকে দশ মিনিটের পথে থাকে। সেখানে তার স্ত্রী, আর পাঁচ ছেলে মেয়ে নিয়ে আছে ছেলে মেয়েরা সবাই স্কুলে পড়ে। যখন যখন সাহেব বাইরে যাবেন টুরে তখন হরিহরও সঙ্গে যাবে।

হরিহরকে জিজ্ঞেস করে নারেণ জানতে পারল যে আগেকার ইন্সপেকটর সাহেব সমস্ত মাল পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর নতুন জায়গায় এবং তাঁর আত্মীয়ের বাড়ী দেখা করতে গেছেন এবং বলে গেছেন যে পবদিন সকালে এসে চার্জ বুঝিয়ে দেবেন।

নীরেণ আবার জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা হরিহর, আমি তোমার সাহেবকে বাড়ীতে কাজ করার একজন লোকের কথা বলেছিলুম। তিনি কি এ বিষয়ে তোমাকে কিছু বলেছেন ?

হরিহর—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি একজন মেয়ে লোককে ঠিক করেছেন সেও কাল আসবে।

নীরেণ মনে মনে খুশী হল। তারপর ঘরের দরজা জানালা গুলো ভাল করে দেখে নিয়ে বললে—হরিহর আজ রাতের খাবার ব্যবস্থা কি

করা যাবে বল। এখানে কাছে কোন হোটেল আছে?

হরিহর—আজ্ঞে হোটেল একটা আছে বটে তবে হরিহর থাকতে আপনারা হোটেলে খাবেন কেন? আমি আপনাদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে দেব। একটা তোলা উনান্ আপনাদের জন্যে এনে রেখেছি আজ একেবারে নতুন।

নীরেণ এ রকম একটি বুদ্ধিমান লোক পেয়ে খুবই খুশী হল। হরিহরকে চাল, ডাল ইত্যাদির পয়সা দিয়ে রিণাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে তক্তপোষের ওপর বসল। স্নিগ্ধা গেল হরিহরের সঙ্গে রান্না ঘর দেখতে।

নতুন জায়গায় নীরেণ আবার মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। একজন মাঝ বয়সী ঝি পেয়েছে। রাতদিন থাকে। চাকর অপেক্ষা ঝিই ভাল। রিণা ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে। এখন অল্প বয়সী চাকর রাখাও ভাল নয়। তাই ঝি সুরবালাকে স্নিগ্ধার খুব পছন্দ।

নীরেণ কিছুদিন টুরে যাওয়া বন্ধ রেখেছিল। সমস্ত দিক সামলিয়ে নিয়ে আবার টুরে যেতে আরম্ভ করল। প্রয়োজন মত তাকে কখন কখন ৪।৫ দিন বাইরে থাকতে হয়। এই ভাবে কাটতে লাগল। এই করতে করতে পূজো এসে গেল। গ্রামের অনেকের সঙ্গে নীরেণদের পরিচয় হয়েছে। এখানে অধিকাংশ কাঁচা ঘর আর অনেক তফাতে তফাতে। নীরেণের বাড়ীর সঙ্গে কিছুটা খালি জায়গা আছে। এই জমিতে নীরেণ সব্জী লাগিয়েছে। যখন সে বাড়ী থাকে তখন সে দুবেলা গাছ দেখাশোনা করে। রিণা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। নীরেণ যখন টুরে যায় স্নিগ্ধা আর রিণা গাছে জল দেয়। রিণার খুব ভাল লাগে। এখানে যদিও ঘর সব দূরে দূরে তবু আন্তরিকতার কোন অভাব নেই মানুষে মানুষে। সহরে কোন বাড়ীর একতলায় লোক মারা গেলে তিনতলার লোকের কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কোন আত্মীয়তা বোধ থাকে না সেখানে।

পূজোর দিন দশেক আগে কাজের ব্যাপারে বাইরে যেতে হল। নীরেণ যখনই বাইরে যায় কবে ফিরবে সেটা কেবল স্নিগ্ধাকে বলে যায়।

অন্য কারুকে বলে না। সুরবালা জানবার চেষ্টা করে কিন্তু কোন ঔৎসুক্য দেখায় না।

নীরেণ দুদিন হল বাইরে গিয়েছে। রোজকার মত স্নিগ্ধা রিণাকে নিয়ে শুয়েছে চৌকিতে—আর মেঝেতে বিছানা করে শুয়ে আছে সুরবালা।

স্নিগ্ধা সুরবালাকে আগেই বলে রেখেছিল যে রাত্রে ঘরের দরজা খুলে বাইরে যাবার আগে যেন স্নিগ্ধাকে ডাকে। সেই মত সুরবালা যখন নীরেণ বাড়ী থাকেনা তখন স্নিগ্ধার ঘরে শোয় আর রাত্রে বাইরে যাবার দরকার হলে স্নিগ্ধাকে ডেকে জানিয়ে তারপর যায়।

আজ রাত্রে রিণার চোখে ঘুম নেই। সে কেবল এপাশ ওপাশ করছে। স্নিগ্ধা সারাদিন খাটাখাটি করে তাই শোবার কিছু পরেই তার তন্দ্রা এসে পড়ল। রিণা মার গায়ে গা দিয়ে সুরবালার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে! আজ তার চোখে একেবারে ঘুম আসছে না। হঠাৎ সে সুরবালার মাথার দিকে জানলাতে তিনটে টোকা মারার আওয়াজ শুনতে পেল বাইরের দিক থেকে। অন্ধকারে জানলার দিকে কিছুই দেখা গেল না। সুরবালা খুব সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠল। অন্ধকারে জানলার ধারে গিয়ে কার সঙ্গে ফিস ফিস করে কি বলল। রিণা কান খাড়া করে কেবল একটা কথা শুনতে পেল হ্যাঁ ঘুমিয়েছে। তারপর সুরবালা পা টিপে টিপে স্নিগ্ধা আর রিণা যেখানে শুয়ে আছে একবার সেখানে এল তারপরে ধীরে ধীরে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

রিণা তার মাকে ঠেলে ধীর গলায় বললে—মা ঝি ঘরের দরজা খুলে বাইরে গেল। স্নিগ্ধার ঘুমের ঘোর কাটতে কাটতে শুনতে পেল সদর দরজার খিল খোলার শব্দ।

রিণা বলল—মা ঐ শোন সদর দরজার খিল খুলল।

স্নিগ্ধা উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করবে কি না একবার ভেবে উঠতে যাবে এমন সময় ভেজান দরজাটা আস্তে খুলে গেল আর এক ঝলক চাঁদের আলোয় দেখল একজন অপরিচিত লোক ঘরে ঢুকল। স্নিগ্ধা

আর উঠল না। অন্ধকারে রিণার মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপ করে থাকতে ইসারা করে নিজেও চুপ করে শুয়ে রইল।

অপরিচিত লোকটি একটি ছোট টর্চের আলোয় আগে ঘরের চার পাশটা ভাল করে দেখে নিল তারপর তার হাতে থাকা একটি চাবীর গোছা দিয়ে সামনের বাক্সটা খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

স্নিগ্ধা চুপ করে দেখছে আর মনে মনে ভাবছে কি করবে। এমন সময় আর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। একদল ডাকাত জ্বলন্ত মশাল, লাঠি—ইত্যাদি নিয়ে রে, রে, রে, করে স্নিগ্ধাদের বাড়ীতে চড়াও হল।

চোর পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। সে দারুণ ভয় পেয়ে রাস্তার ধারের জানলার কাছে গিয়ে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে বাইরে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, তখন দেয়ালের ওপর থেকে চালের বাশের মটকায় চড়ে চুপ করে বসে রইল।

চোরটা মটকায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ডাকাত মুখে কালি ঝুলি মেখে স্নিগ্ধার ঘরে ঢুকে পড়ল। রিণা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সর্দার ডাকাত স্নিগ্ধার কাছে এসে নেশার ঝোঁকে বলল—"মা, তোদের আমি গায়ে আচড়টা লাগতে দেব না, বাক্স, সিন্দুকের চাবা যেখানে আছে সব বার করে দে।"

স্নিগ্ধা অনেক সাহস সঞ্চয় করে উঠে চৌকী থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল আর রিণাকে হাত ধরে পাশে নিয়ে বললে—বাবা, কত্তার আক্কেলটা একবার দেখ। আমাদের ফেলে, নিজে বাঁচবার জন্যে চাবির গোছা নিয়ে ঐ মটকায় উঠেছে। বিশ্বাস না হয় তোমরা মশালের আলোয় দেখ।

সর্দার তখন তার দুই সঙ্গীকে বললে—এরে হীরু, এই পালান, দেখাত মশালটা ওপরে। সর্দারের কথা মত মশালের আলোতে সবাই দেখল একজন লোক মটকাতে বাঁশের আড়ালে বসে আছে।

ব্যস্ আর যায় কোথায়? সর্দার তার জলদ্ গম্ভীর গলায় আওয়াজে একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে বললে—শীগ্গির নেমে আয় ভালয় ভালয় তা না হলে আজ আর তোকে আস্ত রাখব না। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।

সর্দারকে আরো উত্তেজিত করবার জন্যে স্নিগ্ধা বললে—ও সহজে নামবে না বাবা। ওর কাছে গুলী ভরা যন্ত্র আছে। তোমরা ওপরে উঠে ওকে নামাও আর বাইরে যারা আছে তাদেরও ডাক।

সর্দার স্নিগ্ধার ওপর বড় খুশী হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে দলের সবাইকে ঘরের মধ্যে ডাকল আর স্নিগ্ধা তার মেয়ে রিণাকে নিয়ে এই ফাঁকে দরজার বাইরে এসে একটা পুরান জামা কাপড়ের সিন্দুক দেখিয়ে বললে—ঐ সিন্দুকের ভেতর পুরাণ কাপড়ের তলায় সব সোনার গয়না আছে। ও যদি না নামে তোমরা ওকে যেন প্রাণে মেরনা বাবা তাহলে তোমার মেয়ের কি হবে একবার ভেবে দেখ।

এই আম কাঠের সিন্দুকে যত কাঁসার বাসন আর পুরাণ কাপড় ছিল। বদলী হয়ে আসার সময় একটা তালা বেশ বড় সড় এতে লাগান ছিল। সিন্দুকটা ঠিক সেই ভাবেই রাখা ছিল। আসার পর থেকে আর খোলা হয় নি।

সকলের নজর পড়ল সিন্দুকের ওপর।

সর্দার বললে—যা বেটি তুই আমাকে বাবা বলেছিস আর সব জিনিস দেখিয়ে দিয়েছিস। আমি তোর কোন ক্ষতি করব না। তুই যা। হীরু সর্দারের কাছে তোর কোন ভয় নেই। স্নিগ্ধা ঘরের বাইরে থেকেই বলল—দেখ বাবা জামাইকে যেন প্রাণে মেরনা। বড় ভয় পেয়েছে। আমার কথা একবার ভেবে দেখ।

সর্দার তখন বললে—তোর কোন ভাবনা নেই, তুই যা।

চারজন ডাকাতকে তখন সর্দার সেই সিন্দুকটা ভাঙ্গতে বললে আর দুজনকে ওপরে মটকাতে উঠতে বলল।

সর্দারের হুকুম মত সবাই কাজে লেগে গেল। সর্দারও খুব গদ্‌গদ্। সেই সময় স্নিগ্ধা ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে টেনে বাইরে থেকে শিকল আর হুড়কো দুটোই লাগিয়ে দিল। কাজে ব্যস্ত সর্দারের খেয়ালই রইল না সেদিকে।

রিণার হাত ধরে স্নিগ্ধা সদরের বাইরে বেরিয়ে সেই দরজারও শিকল

এবং হুড়কো দুইই লাগাল বাইরে থেকে। তারপর ছুটে কাছে যে বাড়ী আছে সেই দিকে যেতে লাগল।

চোরটা এতক্ষণ এই সব দেখে একেবারে ভয়ে কাঠ হয়ে ছিল। তার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। সদারের আর একবার ধমক খেয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে এসে সদারের পায়ের কাছে চাবীর গোছা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললে—দোহাই বাবারা আমি এ বাড়ীর কত্তা নই। আমি আপনাদেরই অধম সন্তান, আমি একজন চোর। আমি এখানে চুরী করতে এসেছিলুম। ধবমবাপ, আমি আপনাদের ভয়ে ওপরে উঠেছি। আমাকে বিশ্বাস করুন আপনারা।

সর্দারের তখন নেশা প্রায় কেটে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে রাগে তার সর্বশরীর জ্বলছে। একটা হুঙ্কার দিয়ে বললে—ধরে আন সেই মেয়েটাকে। আজ তাকে মশালে পোড়াব।

ঘরেব দরজা বাইবে থেকে বন্ধ। শক্ত কাঠের দরজা। অত সহজে ভাঙ্গা সম্ভব নয়। দমাদম লাথি পড়তে লাগল দরজায়।

সর্দার তখন ক্ষিপ্ত হযে উঠেছে। সকলকে গালাগাল দিতে লাগল। সামান্য একটা মেয়ের কাছে তাদের এই ভাবে অপদস্থ হওয়াতে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ল। তাব বাজখাই গলায় হুকুম দিল ভাঙ্গ দরজা, ভাঙ্গ জানালা।

থানার বড়বাবু এই গ্রামে ডাকাতি হবে এ খবর পেয়েছিলেন। হীরু সর্দারের নামও তিনি পেয়েছিলেন। তিনি কিছু পুলিস আর চৌকিদার নিয়ে কাছের একটা জঙ্গলে ছিলেন। তার কাছে ছিল চারটে বন্দুক। আর গ্রামেব কিছু ছেলেও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

হীরু সর্দার তার দলবল সমেত ইঁদুর কলে আটকাবার মত সেদিন ধরা পড়ল স্নিগ্ধার কৌশলে।

অপরাধী

সুনীল চ্যাটার্জি আজ কয়েকমাস চাকরী থেকে অবসর নিয়েছে। সে রেল অফিসে কাজ করত। অবসর নিয়ে আসার সময় প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে বেশ ভাল টাকা পেয়েছে। গঙ্গার ধারে তার বাড়ী। বাড়ীর সঙ্গে লাগা খানিকটা বাগান। এই বাগানে সমস্ত রকম তরিতরকারি হয়। তার সংসারের প্রয়োজনীয় সমস্ত তরকারিই এই বাগান থেকে পায়। কয়েক বিঘা ধানজমি আছে; তাতে যা ধান হয় তা দিয়ে তার সারা বছর চলেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। চ্যাটার্জি প্রতি বছর কিছু ধান বিক্রী করে। আগে ধানের দাম কম থাকায় বেশী লাভ হত না। আজকাল ধান থেকে বেশ দু পয়সা আসে। এখানে চ্যাটার্জির বাস আজ চার পুরুষের; সকলেই তাকে এখানে চেনে আর সকলেই জানে যে সে কোন ঝঞ্ঝাটে থাকে না। দুই ছেলে রেলে কাজ করে, দুই মেয়ের অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। এখন দুই ছেলের বিয়ের জন্যে কথাবার্তা চলছে।

অবসর নেবার পর চ্যাটার্জি রোজ ভোরে বেড়ায় ও গঙ্গাস্নান করে তারপর এসে তাব বাগানের কিছু কাজ কর্ম করে। এতে তার শরীর আর মন দুইই বেশ ভাল আছে। চ্যাটার্জি গিন্নী কাত্যায়নী বেশ হিসেবী বলে খ্যাতি আছে। তাদের সংসার বেশ সুখেই চলছে। প্রথম প্রথম চ্যাটার্জির বেশ অস্বস্তি বোধ হত কারণ বত্রিশ বছর সে একটানা কাজ করেছে, একটা নিয়মের মধ্যে থেকেছে আর হঠাৎ তার জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেনি। রোজ নিয়মিত অফিসে যাওয়া, সহকর্মীদের সঙ্গে একত্র কাজ করা এমন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে অবসর নেবার পরেও চ্যাটার্জি সপ্তাহে একবার তার সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারত না। মনের যত কথা সারা সপ্তাহ ধরে জমিয়ে রেখে ঐ একদিন সে দিত সহকর্মীদের কাছে উজাড় করে। সেই একটা দিনের জন্যে সে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করত।

যারা হালে চাকরীতে ঢুকেছে সেই ছেলে ছোকরারা অনেকে চ্যাটার্জিকে দাদু বলে ডাকত। তারা ঠাট্টা করে বলত যে দাদু অফিসের মায়া ছাড়তে পারছেন না। চ্যাটার্জি শুনে হাসত কোন জবাব দিত না। জবাব দিত মনোরঞ্জণ বাবু যিনি চ্যাটার্জির জায়গায় কাজ করেন —হ্যাঁ হে হ্যাঁ, তোমরাও বুঝবে যে এ মায়া কাটান কত শক্ত। তোমাদের দিন অমুক। বেঁচে থাকলে দেখব। ছোকরার দল চুপ করে থাকে। চ্যাটার্জির দিন এইভাবে কাটতে লাগল। তার একটা মস্ত গুণ সে কখনও চটত না। এই কারণে কি ছেলে কি বুড়ো সবাই তাকে ভালবাসত। বহুদিন কাজ করায় ফলে তার ব্যুৎপত্তিও হয়েছিল অনেক। বহুদিনের পুবাণ ব্যাপার তার একেবারে নখ দর্পণে ছিল। চ্যাটার্জি যখনই অফিসে আসত মনোরঞ্জন বাবু তার সঙ্গে পুরাণ ব্যাপাবে অনেক আলোচনা করত। চ্যাটাজি বেশ আগ্রহের সঙ্গে কিছু প্রয়োজন হলে বুঝিয়ে দিত। কোন দিন বিরক্ত হত না। তার আগ্রহ আর বোঝাবার কায়দা দেখলে মনে হত যেন সে সেই আগেকার মতই আছে। কে বলবে যে সে অবসর নিয়েছে! তাকে দেখে মনে হয়—বোধ হয় এখনও আরও চার পাঁচ বছর বেশ ভাল ভাবে কাজ করতে পারে। সহকর্মীদের কাছে এরকম কথা শুনলে তাব মুখ গর্বের হাসিতে ভরে উঠত। সে মনে মনে ভাবত "আরে শাল পচা হলেও শাল"। তার কদর ছেলে ছোকরারা কি বুঝবে! বুঝত পুরাণ কালের সাহেবরা। আজ তারা থাকলে কি আর তাকে এমন সহজে ছাড়ত? এই সব ভাবতে ভাবতে চ্যাটার্জি আনমনা হয়ে পড়ে। সে ধীরে ধীরে তার পুরাণ বাঁশের বাঁটের ছাতাটা নিয়ে উঠে পড়ে আর চলতে সুরু করে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিয়ে চলে যায়।

আজ কদিন ধরে চ্যাটার্জির ভোরে বেড়ান হচ্ছে না। রোজই বৃষ্টি প্রায় লেগেই আছে। সারা রাত বৃষ্টি হয় আর সকালে খুব বেশী বৃষ্টি না হলেও ঝির ঝির করে বৃষ্টি হতে থাকে তাতে বাইরে যাওয়া যায় না। চ্যাটার্জির নিত্যকার অভ্যাসমত বেড়াতে না পেরে শরীরটা ম্যাজ

ম্যাজ করতে থাকে। বৃষ্টির জন্যে বাগানের কাজও বন্ধ। আগেরদিন দুপুর থেকে বৃষ্টি ধরেছে। সকালে চ্যাটার্জি তার লাঠিটা হাতে নিয়ে আর ক্যাম্বিসের জুতা পায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বৃষ্টি হচ্ছে না বটে তবে আকাশ বেশ মেঘাচ্ছন্ন। ঠিক বেলা কতটা তার বোবঝার উপায় নেই তবে রাত আর নেই সেটা বেশ ভালই বোঝা যাচ্ছে কারণ গাছে গাছে পাখীর কলরব উঠেছে।

চ্যাটার্জি তার নিত্যকার যাবার পথ ধরে গঙ্গার ধার দিয়ে চলতে লাগল। গঙ্গার ধারে এই পারে হাঁটা পথটা ভিজে হলেও কাদা নেই। আগে এই পথটি নদীর গর্ভেই ছিল। চড়া পড়ে এই জায়গাটা উঁচু হয়েছে তাই এখানে মাটির সঙ্গে বালির অংশ অনেকটা আছে। কাদাও হতে পারে না। চ্যাটার্জি ধীরে ধীরে চলতে লাগল। মিনিট পাঁচেক চলার পর তার দৃষ্টি পড়ল পায়ে চলা পথের হাত দশেক দূরে একটা ঝোপের ধারে একটা বস্তার মত কি পড়ে। চ্যাটার্জি একবার থামল। তখনও ভালভাবে সকালের আলো ফোটে নি। আকাশে মেঘ থাকায় ঐ জায়গাটা একটু অন্ধকার মত ছিল। এই জায়গাটা অপেক্ষা-কৃত নির্জন বলে এখান দিয়েই নদীর চোরেরা মাল পাচার করে। চ্যাটার্জি ভাবল হয়ত কোন চোরাই মালের বস্তা পড়ে আছে। সে ঠিক করল যে বেড়িয়ে ফেরার সময় যখন আকাশ আরো ফর্সা হবে তখন ভাল করে দেখবে। সে আর দাঁড়াল না এগিয়ে চলতে লাগল। দূরে গঙ্গার বুকে দু একটা ছোট নৌকা আবছা দেখা যাচ্ছে। সেই সব নৌকা থেকে ক্ষীণ আলো তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। চ্যাটার্জি সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পাড়ের কাছে ঢেউগুলো ছলাৎ ছলাৎ করে পড়ছে। অনেক দূরে একটা মোটরলঞ্চ এই সকালের আকাশকে কাঁপিয়ে তার ভোঁ দিয়ে তরতর্ করে এগিয়ে চলেছে। সেই জন্যেই এই ঢেউ এর সৃষ্টি হয়েছে। নৌকাগুলো ঢেউয়ের তালে তালে ওপরে উঠতে লাগল আর নীচে নামতে লাগল। সাদা বড় বড় চিলের মত হাঁস জলের ওপর বসে স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে চলেছে স্বচ্ছন্দে। খঞ্জনা পাখী পাড়ের কাছে চঞ্চল

ভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে। কখন কিছুটা এগিয়ে যাচ্ছে আবার তার বেগে পিছিয়ে আসছে। যেখানে দাঁড়াচ্ছে সেখানে তার লেজটা অনবরত নাচাচ্ছে।

চ্যাটার্জি স্থির হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল তারপর পূব আকাশে দেখল যে অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। পূব আকাশের দিকে চেয়ে চ্যাটার্জি সূর্য্যের স্তব পাঠ করল—

জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেযং মহাদ্যুতিম্
ধান্তোরিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

স্তব পাঠ করে সূর্য্যকে নমস্কার করে চ্যাটার্জি আবার এগিয়ে চলতে লাগল। রোজই সে প্রায় এক ঘণ্টা বেড়ায়। তার একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে। সেই পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে তার রোজই ঐ সময়টা লাগে। আজও তার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার পর সে ফিরতে লাগল। বস্তার কথা তার মন থেকে একরকম মুছে গেল। বস্তার কাছাকাছি এসে সেটা তার নজরে পড়তে তার খেয়াল হল। বস্তাটা ঠিক সেই ভাবেই আছে।

এই পায়ে হাটা রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। কাছাকাছি কোন বসতি নেই। নদীর চোরেরা সেই জন্যে এই অঞ্চলটা তাদের গতিবিধির বেশ উৎকৃষ্ট জায়গা বলে বেছে নিয়েছে। কাছাকাছি কয়েকটা বাগান আর দূরে দূরে কয়েকটা পাকা বাড়ী আছে। এই পাকা বাড়ী গুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড় সেটা হল হরেণ ঘোষালের। মস্তবড় তিন তলা বাড়ী। দূর থেকে যেন সমস্ত বাড়ীগুলোর মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয়। ঘোষাল এই অঞ্চলের সব চেয়ে ধনালোক। সে একটি প্রকাণ্ড ইটখোলার মালিক। এই ইটখোলাটি ঘোষালের বাড়ী থেকে একটু দূরে গঙ্গার ধারেই। এই ইটখোলাটি প্রথমে যেখানে আরম্ভ হয়েছিল এখন সে জায়গায় বিরাট বিরাট জলাশয় বর্তমান। এই সমস্ত জলাশয় এখন পরিত্যক্ত, নির্জন। এখানে ঘোষাল মাছের চাষ করে। তার কর্মচারীরা আসে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে আর ছুটির দিনে ঘোষালের

জানাশোনা বন্ধু-বান্ধব, সরকারী এবং বেসরকারী কর্মচারীরা এখানে ছিপ ফেলতে আসেন। এখানে বেশ ভাল মাছ পাওয়া যায়। সেই কারণে এখানে মাছ ধরবার জন্যে ঘোষালের কাছে মাছধরার ব্যাপারে অনেকেই উমেদার। পুলিশ সাহেব, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা অনেকেই এখানে আসেন এবং সেই সূত্রে ঘোষালের সঙ্গে সকলেরই আলাপ আছে। এই কারণে ঘোষাল নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করে।

ক্রমশঃ মাটি কেটে কেটে ইটখোলাটি এখন যেখানে এগিয়ে গেছে সেই জায়গাটি প্রথম যেখানে ইটখোলা আরম্ভ হয় সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। এখন ফেলে আসা জায়গাগুলোতে বড় বড় ঝিলের মত হয়েছে আর সেই সমস্ত ঝিলের পাড়ে বহু প্রকার বন্য গাছ গাছড়ার জঙ্গল হয়ে আছে। নতুন ইটখোলায় এখন নিত্য বিশ পঁচিশ জন কাজ করছে। সেখানে সারি সারি কাঁচা ইট সাজান আছে। দূর থেকে বেশ ভাল দেখায়। ঘোষাল রোজ অন্ততঃ একবার এই নতুন ইট খোলায় আসে। কাজের তদারক করে ফিরে যায় সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে।

সংপ্রতি ঘোষাল একটা বেশ বড় সরকারী কনট্রাক্ট পেয়েছে। এক কোটি ইট তাকে সরবরাহ দিতে হবে। এই ইটখোলায় পূরাদমে কাজ চলেছে। এই বর্ষা কালটায় কাজের বড় অসুবিধে হয়। বিশেষ করে গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কাজ একেবারে বন্ধ গেছে। আবার কাজ সুরু হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজের বিরাম নেই। আর মাত্র কয়েক লক্ষ ইট হলেই এক কোটি পূর্ণ হয়। এই ইটের কারবারে ঘোষাল অনেক টাকা করেছে। বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্কে কয়েক লক্ষ মজুত টাকা সবই এই ইটখোলার দৌলতে।

ঘোষাল সাধারণ ব্যবসায়ীর মত নয়। সে উচ্চ শিক্ষিত এবং তার রুচিও বেশ মার্জিত। তার বাড়ীতে আছে এক বিরাট আধুনিক লাইব্রেরী। সেখানে আছে দেশী ও বিদেশী ভাল লেখকের যত বই, আছে দর্শন ও ইতিহাসের সমস্ত বই। এই লাইব্রেরীটাই ঘোষালের

প্রাণের সমান। এইখানেই কাটে তার সারাদিনরাতের একটা বেশ বড় অংশ।

ঘোষালের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন দাস-দাসীর কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সে বড়ই দুঃখী ছিল কারণ তার এই বিরাট সম্পত্তি ভোগ করবার কেউ ছিল না। ঘোষাল দুবার বিয়ে করেছিল। প্রথম স্ত্রী অতি অল্প বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয়া স্ত্রীও একমাত্র শিশু কন্যা উমাকে রেখে প্রায় পনর বছর আগে মারা গেছে। তখন থেকে ঘোষাল এই শিশুকন্যাকে অতি যত্নে মানুষ করে তোলে। এই মেয়ের মুখ চেয়ে আর তৃতীয় বার দার পরিগ্রহ করে নি।

ভগবানের বিচার মানুষের বুদ্ধির বাইরে। এক বছর আগে বহু ঘটা করে ঘোষাল তার এই একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে দেয় পাশের গ্রামের জমিদার নীলাম্বর মুখুজ্যের একমাত্র ছেলের কাছে। এত ঘটাঘটি করে বিয়ে এই অঞ্চলে এর আগে আর কেউ দেয় নি। পনর দিন ধরে সারা গ্রাম যেন একটা উৎসবের মধ্যে কাটিয়েছিল।

কিন্তু ভগবানের বিচার কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিচার করে না। বিয়ের এক মাসের মধ্যে দারুণ টাইফয়েড রোগে এই মেয়েটি সংসারের সকল বাঁধা কাটিয়ে অকালে চলে যায়। ঘোষাল এর আগে আরও অনেক আঘাত পেয়েছিল কিন্তু এই আঘাতে তার শরীর ও মন দুইই ভেঙ্গে পড়ল। এখন তার নিজের জন বলতে আর কেউ রইল না। এখন তার বেশীর ভাগ সময় কাটে তার লাইব্রেরীর মধ্যে। বইয়ের মধ্যে ডুবে থেকে সে মনে শান্তি পায়, সে তার দুঃখ ভুলে যায়। এখন তার দেখাশোনা করে তার বহু দিনের বিশ্বাসী চাকর নীলমনি।

নীলমনি ঘোষালকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। সে ঘোষালের কেবল চাকরই নয় সে তার অভিভাবকও বটে। সে লক্ষ্য করে যে মেয়ে মারা যাবার পর থেকে ঘোষাল কেমন উন্মনা হয়ে পড়েছে। ঘোষালের যেন কোন কাজেই মন বসেনা। আগেকার উৎসাহ আর তার নেই। কাজকর্ম দেখাশোনা করে কর্মচারীরা আর ঘোষাল অধিকাংশ সময় কাটায় লাইব্রেরীতে।

এ জগৎ ঘোষালের কাছে মিথ্যা বলে বোধ হতে লাগল। কখনও কখনও কাজে যায় কিন্তু আগের মত আর উৎসাহ নেই কোন কাজে। রাত দিন ভেবে ভেবে তার আর কিছু ভাল লাগে না। সেই মা মরা মেয়েটাকে সে কত আদর যত্নে মানুষ করেছিল। শোবার ঘরে গেলেই তার উমার কথা মনে পড়ে আর কিছু ভাল লাগে না। নীলমনি ঘোষালের এই অবস্থা কদিন ধরে ভাল ভাবে লক্ষ্য করছে। কয়েকদিন বলবে বলবে মনে করে একদিন ঘোষালকে বললে যে কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসা দরকার। রাত দিন ভেবে ভেবে কি হবে? বাইরে ঘুরলে তার মনটাও ভাল থাকবে।

ঘোষালও কদিন ধরে ভাবছিল সে কোথাও যাবে। তার এখানে আর ভাল লাগছে না। নীলমনির কথা শুনে আজ সে বলল—হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি। আমি প্রথমে গয়ায় যাব। স্ত্রী মারা যাবার পর গয়ায় যাবার কথা ছিল সেটা এখনও হয় নি। গয়ার কাজ সেরে কিছুদিন বৃন্দাবনে যাব।"

নীলমনিকে আর দ্বিতীয় বার বলবার দরকার হল না। পরদিনই পোটলা পুটলি নিয়ে নীলমনি ঘোষালকে নিয়ে গয়ায় রওনা হয়ে গেল।

ফল্গু নদীর জলে স্নান করে ঘোষালের শরীর ও মন দুইই ঠাণ্ডা হল। গয়ায় কাজ সেরে আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে কিছু সাধু মহাত্মার দর্শন করে ঘোষাল বেশ শান্তি পেল। সেখানকারই এক সাধুর উপদেশ মত ঘোষাল নীলমনিকে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে বেরিয়ে পড়ল।

এক সঙ্গে তিন মাস ঘোষাল কাটাল বৃন্দবনে। এখানে থাকা কালে তার মনে তীব্র বৈরাগ্য দেখা দিল। সে ঠিক করল যে বৃন্দাবনেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে শ্রীমতি রাধারাণীর আশ্রয়ে। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ভাল ভাল সাধুর আশ্রমে ঘুরে তাঁদের মুখে উপদেশ শুনে ঘোষাল সংসার প্রায় ভুলতেই বসল। বৃন্দাবনে রাধাকুঞ্জের কাছে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছে ঘোষাল দীক্ষা নিয়ে বৃন্দাবন পরিক্রমা করার মনস্থ করল। নীলমনির ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং সন্ন্যাসীর আদেশে

ঘোষাল আবার দেশে ফিরল।

দেশে ঘোষাল ফিরল বটে তবে এ সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘোষাল। তার চেহারায় এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। তার কপালে চন্দনের ফোঁটা আর গলায় তুলসী মালা। রোজ সকালে ঘোষাল বেড়ায় আর গঙ্গাস্নান করে। তারপর তার অনেক সময় কাটে পূজার্চনায়। তারপর দেখে ব্যবসার কাজকর্ম। এখন সে নতুন উদ্যমে তার কাজে মন দিয়েছে। আগে ঘোষালের বেশ কৃপণ বলে বদনাম ছিল কিন্তু বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর ঘোষাল একেবারে বদলে গেছে। সেখানে যত সভা সমিতি ক্লাব আছে সব জায়গায় এখন সে প্রতিমাসে চাঁদা দেয়। এ ছাড়া মেয়ের বিয়ে, মা বাপের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে বহুলোক তার কাছে উপকৃত। সকলেই এখন ঘোষালের মঙ্গল এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে।

ভোরে বেড়ান আর গঙ্গাস্নান নিয়েই চ্যাটার্জির সঙ্গে ঘোষালের ঘনিষ্ঠতা। আগে তাদের যথেস্ট পরিচয় ছিল কিন্তু সে পরিচয় এক স্থানের অধিবাসী হিসেবে। বর্তমানে তাদের পূর্ব পরিচয় আরও নিকটতর হয়েছে।

বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর ঘোষাল লক্ষ্য করেছে যে তার অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী জুটেছে। এরা অনেকেই ঘোষালকে আবার বিয়ে করে সংসারী হবার জন্যে অনুরোধ জানায় তবে ঘোষালের ব্যবহারে তারা নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে যায়। ফিরে যাবার সময় কেউ কেউ আক্ষেপ করে বলে যায়—যাদের খাবার সংস্থান নেই তাদের পোষ্য দিন দিন বেড়েই চলেছে আর যার টাকায় ছাতা পড়ছে তার খাবার লোক নেই। ভগবানের কি বিচার!

ঘোষাল পরোক্ষ ভাবে সকলকে জানায় যে তাদের আক্ষেপের কিছু নেই। সে তার সমস্ত সম্পত্তি সৎকাজে দান করে যাবে।

চ্যাটার্জি বেড়িয়ে ফেরার সময় যখন দ্বিতীয়বার সেই বস্তাটা তার নজরে পড়ল তখন সে সেখানে দাঁড়াল তারপর তার হাতের লাঠিটা ভাল ভাবে শক্ত করে ধরে সেই দিকে এগিয়ে গেল। কাছে এসে

ভাল করে দেখল যে বস্তাটা বেশ বড় এবং তার মুখের ফাঁক দিয়ে একটা পায়ের আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে। যদিও ভোরের আলো তখন অনেকটা প্রকাশ হয়েছে তবুও চ্যাটার্জির গাটা যেন ছমছম করে উঠল। দূরে একটা বটগাছের মাথায় ফাটল ধরা মেঘের ফাঁক দিয়ে খানিকটা সকালের সোনালী রোদ এসে পড়েছে। অনেক দূরে চোখ গেল চোখ গেল বলে পাখী ডেকে উঠে ভোরের নিস্তব্ধতাকে যেন আরও নিস্তব্ধ করে দিল। চ্যাটার্জি একবার চারদিকে চেয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। এখান থেকে চ্যাটার্জির বাড়ী বেশী দূরে নয়, মাত্র মিনিট দশেকের রাস্তা কিন্তু এর মধ্যে তিনটি বেঁক আছে তাই তার বাড়ীটা এখান থেকে দেখা যায় না। কি করবে চ্যাটার্জি ঠিক করতে পারল না। একবার ভাবল যে থানায় খবর দেবে কিন্তু আবার মনে হল থানায় খবর দিলে তাকে অনেক হয়রানি ভোগ করতে হবে। এ সব ব্যাপারে সে জানে থানায় ও কোর্টে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, তারপব আবার কোর্টে উকিলের জেরা। সে নিজে ভুক্তভোগী। তার স্মৃতি পথে ভেসে উঠল তার চাকরী জীবনের কথা।

তার চাকবী জীবনে একবার রেল কোম্পানীর তরফে তাকে সাক্ষী দিতে কোর্টে যেতে হয়েছিল। একটা চোর ধরা পড়েছিল রেলের জিনিস সমেত। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল চোরটা। ধরেছিল চ্যাটার্জিই। একেবারে সত্যি কেস কিন্তু কোর্টে কি নাজেহালটাই না তাকে হতে হয়েছিল। কোথা থেকে একটা উকীল তাকে এমন জেরা আরম্ভ করল যে সকলে মনে করতে লাগল যে চ্যাটার্জিই জিনিসটা চুরি করে ধরা পড়ার ভয়ে ঐ লোকটার হাতে দিয়ে মিথ্যে কেসে জড়িয়েছিল। জেরার সময় চ্যাটার্জির আপাদমস্তক জ্বলছিল ঐ উকীলটার কথায়। সরকারী উকীল কিছু বলতে গেলে অন্য উকীলটি বলতে দেয় না চ্যাটার্জিকে নিয়ে যেন টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলার মত করতে লাগল। চ্যাটার্জির চোখে জল এসে গিয়েছিল। আর একটু হলে একটা কিছু অনর্থ ঘটে যেত কিন্তু হাকিম চ্যাটার্জিকে বাঁচিয়ে দিলেন। হাকিমের হুকুম মত সেই উকীল জেরা থামান। চ্যাটার্জির যেন ঘাম

দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সেদিন থেকে চ্যাটার্জি নাকে কানে খৎ দিযে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আর কখনও সে কোর্টে সাক্ষী দেবে না। আজ বস্তার মধ্যে মানুষের পা দেখে তার সেই আগেকার কথা মনে পড়ে গেল আর তার মাথায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে হাজির হল।

ছুটো ছুটি করার বয়েস এখন আর তার নেই। তবে সে কি বাড়ী ফিরে যাবে ? না তা হয় না। সে এ পথ দিয়ে রোজ বেড়াতে যায় এ কথা সকলে জানে। পরে লোকে তাকে সন্দেহ করবে। তার চেয়ে যা হবার তা হবে এভাবে এটাকে ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কি করা যায়। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তার মনে পড়ল ঘোষালের কথা। ঘোষাল ত বেশ প্রভাবশালী লোক। তার কাছে গিয়ে পরামর্শ করলে কেমন হয় ? তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে এইটাই সে স্থির করল।

ওই জায়গা থেকে ঘোষালের বাড়ী দেখা যায় কিন্তু সেখানে যেতে সামনে একটা প্রকাণ্ড পুকুর পড়ে তার ওপারে বাড়ী। হাঁটা পথে প্রায় আধ মাইল হবে। চ্যাটার্জি ঘোষালের বাড়ীর দিকে চেয়ে কি ভাবল তারপর সেই দিকে চলতে লাগল। বারদুই চ্যাটার্জি পেছন ফিরে দেখল কিন্তু কাকেও দেখতে পেল না।

পুকুরের লম্বা দিকের পাড় শেষ হলেই বাঁ দিকে ঘোষালের বাড়ী। বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছতে চ্যাটার্জি দেখল যে ঘোষাল বেড়িয়ে ফিরছে। ঘোষালের জামায়, কাপড়ে, জুতোয় কাদা লেগে আছে আর মাথার চুল এলোমেলো। চ্যাটার্জি নমস্কার করতে ঘোষাল প্রতি নমস্কার করল।

চ্যাটার্জি বললে—কি খবর আজ, এত তাড়াতাড়ি ফেরা হল যে ?

ঘোষাল বেশ উত্তেজিত ভাবে জবাব দিল—হ্যাঁ, না, মানে আজ একটু আগেই ফিরেছি, মানে পা পিছলে পড়ে গিয়ে সব কাদায় মাখামাখি হয়েছে। এত সকালে কিছু বলার আছে নাকি ? কি ব্যাপার ?

চ্যাটার্জি এক নিশ্বাসে বলে গেল—গঙ্গার ধারে যে পায়ে হাঁটা রাস্তাটা আছে না, সেই রাস্তার পাশে একটা ঝোপের মধ্যে বড় বস্তায়

বন্ধ একটা মানুষের লাস পড়ে আছে।”

ঘোষাল আশ্চর্য হলে বললে—এ্যাঁ কি বললেন ? মানুষের লাস ?

চ্যাটার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, মানুষের মড়া বলেই মনে হচ্ছে। বস্তার মুখটা বাঁধা আছে বটে তবে তার ফাঁক দিয়ে একটা পায়ের আঙুল বেরিয়ে আছে। অসুন একবার দেখতে।

ঘোষাল—রাধামাধব ! এই সকাল বেলা মড়া ! বস্তার মধ্যে ? নিশ্চয়ই কেউ খুন করে ফেলে রেখে গেছে। আচ্ছা, মড়াটা পুরুষের না স্ত্রীলোকের ?

চ্যাটার্জি—তাতো বলতে পারি না তবে একটা পা বেরিয়ে আছে আর তা দেখে মনে হয় এটা কোন মানুষের লাস।

ঘোষাল—রাধামাধব ! কি সর্বনাশ ! কি মহাপাপ ! নীলমণি, ও নীলমণি——”

ঘোষালের চীৎকারে নীলমণি ও আরও কয়েকজন চাকর তাড়াতাড়ি চোখ রগড়াতে রগড়াতে সেখানে এল।

ঘোষাল তখনও চেচাচ্ছে—কি ভীষণ কাণ্ড ! খুন ! তার পর চ্যাটার্জির দিকে চেয়ে বললে—আপনি একটু দাঁড়ান আমি এখনি কাপড়টা ছেড়ে আসছি।

ঘোষাল বাড়ীর ভেতর ঢুকে যাবার পর নীলমণি চ্যাটার্জিকে ঐ লাস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে লাগল। চ্যাটার্জিও যতটা দেখেছিল সব বললে আর অধীর ভাবে পায়চারী করতে লাগল ঘোষালের প্রতীক্ষায়।

চ্যাটার্জি মনে মনে ভাবতে লাগল যে তার দিন সুরু হয়েছে এই লাস দিয়ে এখন সারা দিনটা কি ভাবে যাবে কে জানে ?

ঘোষাল কাপড় জামা পালটে এসে নীলমণিকে বললে—এখনি একজনকে থানায় পাঠিযে দাও আর কয়েকজন লোককে নিয়ে আমাদের পেছনে এস।

ঘোষাল চ্যাটার্জির সঙ্গে চলতে রইল। চ্যাটার্জি আজ বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছে। বস্তার মধ্যে মানুষের লাস জানবার পর থেকেই তার একটু ভয়ও হয়েছে। আবার থানা পুলিশ, সাক্ষী, জেরা

তাকে নিয়ে টানাটানি, হায়রানির একশেষ—। আবার তার মনে হল যদি বস্তাটা খোলার পব দেখে যে তার জানাশোনা কোন লোকের মৃত দেহ ? না, না, নারায়ণ নারায়ণ, যেন সে রকম কিছু না হয়।

ঘোষাল চ্যাটার্জির সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। একবাব বললে—একি কাণ্ড! আর ত নির্ভাবনায় চলাফেরা করা সম্ভব হবে না। বদমায়েসের আনাগোনা এদিকেও আরম্ভ হয়ে গেল। এই অঞ্চলটা আগে বেশ নিরাপদ ছিল কিন্তু এযে বড় সাংঘাতিক কথা। একলা ভোরে যে আর বেড়াতে যেতে ভরসা হয় না। আচ্ছা কে এমন কাজ করল বলুন ত ?

চ্যাটার্জি ছোট ছোট উত্তর "কি জানি ?" "সত্যিইত" ইত্যাদি দিতে দিতে চলছিল। হঠাৎ ঘোষাল জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, লাসটা পুরুষের না স্ত্রীলোকের আপনার কি মনে হল ?

চ্যাটার্জি একটু বিরক্ত হয়েই বললে—কি করে জানব মশায়, আমি ও বস্তাটা খুলিনি! কেবল একটা পায়ের আঙ্গুল দেখে আমি বুঝতে পারি নি লাসটা পুরুষের না স্ত্রীলোকের।

এই ভাবে কথা বলতে বলতে ঘোষাল আর চ্যাটার্জি ঘটনা স্থলে এসে পৌঁছাল। নীলমণিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল দু চারজন লোক সঙ্গে নিয়ে। তারা সবাই সেই বস্তার কাছে দেখতে পেল যে চ্যাটার্জির কথা ঠিক। বস্তার ফাঁক দিয়ে একটা মানুষের পা দেখা যাচ্ছে। নীলমণির সঙ্গের লোকেরা বস্তার মুখটা খোলার কথা বলতে চ্যাটার্জি বাঁধা দিয়ে বললে—না, এটা খুনের ব্যাপার থানার দারোগা না আসা পর্যন্ত এটা খোলা হবে না।

চ্যাটার্জির কথা সকলে মেনে নিয়ে অপেক্ষা করতে রইল পুলিশের জন্যে।

চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে বস্তার মধ্যে একটা মৃতদেহ আছে। একজন দুজন করে ধীরে ধীরে লোক সেখানে জমতে লাগল। যারা এসে জমা হয়েছে তারা পরস্পর আলোচনা করতে লাগল তাদের মধ্যে কে, কবে, কোথায়, কিভাবে এই রকম বস্তা বন্দী লাস পড়ে

থাকতে দেখেছে। বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। লোকও জড় হয়েছে অনেক। সকলেরই আগ্রহ বস্তার মধ্যে কার মৃতদেহ দেখবার জন্যে। পুলিশ এখনও এসে পৌছয় নি। দু একজন মন্তব্য করছে পুলিশ এত দেরী করছে কেন? পুলিশের স্বভাবই দেরী করা।" আর একজন বললে কেন মশাই পুলিসকে অযথা দোষ দিচ্ছেন? থানায় লোক গেছে এখনি এসে পড়বে। রাস্তাটাও ত কম নয়! প্রথমজন বললে পুলিশের নামে আপনার গায়ে অত লাগছে কেন মশাই। পুলিস কি আপনাকে কিছু দেয় নাকি?

যাকে উদ্দেশ করে বলা হল সে ব্যক্তি তখন ভীড়ের মধ্যে অন্য জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে শুনতে পেল না। শুনতে পেলে হয়ত আরও বাদানুবাদ চলত। যে লোকটি উত্তর দিয়েছিল সে আফশোষ করতে রইল যে অমন সুন্দর মন্তব্য বৃথাই গেল।

এই সময় ভীড়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। পুলিস এসেছে পুলিস এসেছে বলে ভীড়ের ভেতর থেকে লোকেরা বলে উঠল।

দেখা গেল থানার বড়বাবু একজন সিপাহীকে নিয়ে আসছেন আর ভীড়ের মাঝখানে ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিচ্ছে। বড়বাবু সেই বস্তার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ও যেন আরও কাছে আসতে রইল। বড়বাবু তখন একটা ফন্দী করে সিপাহীকে জোরে বললেন নিবারণ, এই ভীড়ের ভেতর থেকে ৮।১০ জনের নাম ঠিকানা নাও যারা আজকের কেসের সাক্ষী হবে এবং কোর্টে সাক্ষী দেবে। এই কথায় মন্ত্রের মত কাজ হল। ভীড় যেমন সামনে এগিয়ে আসছিল ঠিক সেইভাবে পেছনে সরে গেল। কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন হল না। নিবারণ যত ভীড়ের দিকে এগিয়ে যায় ভীড় তত পেছিয়ে যায়। জনতা বেশ খানিকটা সরে যাবার পর বড়বাবু চেঁচিয়ে বললেন—নিবারণ, থাক ঐখানে দাঁড়াও, ওরা যখন আসতে চায়না সাক্ষী দিতে আর এদিকে আসতে দিও না।

এর পর বড়বাবু ঘোষাল আর চ্যাটার্জিকে সঙ্গে নিয়ে ডোমের সাহায্যে সেই বস্তাটা খোলালেন। একটা পনর ষোল বছরের মেয়ের

মৃতদেহ পাওয়া গেল বস্তার মধ্যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়। মৃতদেহের হাত দুটো মুঠো বন্ধ আর গলায় পরিষ্কার আঙ্গুলের দাগ স্পষ্ট কালো হয়ে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির চোখ দুটো খোলা আর যেন চোখের তারা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তার মুখে একটা অব্যক্ত বেদনার ছাপ। মৃতদেহের গলায় জড়ান আছে তার মাথার লম্বা বেণীটি। মৃতদেহটা মুচড়ে ছোট করে ঐ থলির মধ্যে ঢোকান হয়েছিল। মৃতদেহটা যখন বস্তা থেকে বার করে মাটিতে শোয়ান হল, চ্যাটার্জির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। সে আর দেখতে পারল না, মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল।

ঘোষাল এমন অভিভূত হয়ে পড়ল যে প্রথমে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। সে খানিকক্ষণ পরে বললে—হা ভগবান! কে এমন করল? এমন নিষ্পাপ ফুলের মত এই মেয়েটিকে কে মারল? ওঃ কি নিষ্ঠুর! তার যেন সর্বনাশ হয়।

সমবেত জনতা অনেক প্রকার হা হুতাশ করতে লাগল।

বড়বাবু এই মৃতের জন্যে যা যা তদন্ত করা প্রয়োজন সে সমস্তই করতে লাগলেন।

সবাই যখন এই নৃশংস হত্যা কাণ্ডের জন্য বিমূঢ় হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই সময় একটা স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দে সকলে সেই দিকে চেয়ে দেখল যে একটি বৃদ্ধা বিধবা সেই দিকে বুকফাটা চিৎকার করতে করতে আসছে। তারপর মৃতদেহটা দেখে ওরে রমারে তুই কোথায় গেলিরে বলে মৃতদেহের পাশে আছাড় খেয়ে পড়ল। মাতৃস্নেহ দ্রবীভূত হয়ে তার চোখ দিয়ে অশ্রুর আকারে ঝরে পড়ছিল। বৃদ্ধা মেয়েটির গায়ে হাত বোলায় আর ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কান্নার মাঝে বৃদ্ধার কাতরোক্তি থেকে জানা যায় যে মেয়েটি বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান। তাকে আগের দিন হাতে কাটা পৈতে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিল তার পর আর বাড়ীতে ফেরে নি। আজ খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে মেয়ের মৃতদেহ দেখতে পেল। আবার বৃদ্ধা কাঁদতে রইল ওরে রমারে আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলিরে, আমি কি নিয়ে থাকব রে।

বড়বাবু বৃদ্ধাকে একটু স্থির হতে বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন মেয়েটির নাম রমা। সে বৃদ্ধার একমাত্র ভরসা। তারা দুজনে হাতে পৈতা কাটে আর রমা তাই বিক্রী করত বাড়ী বাড়ী। এই ভাবে অতি কষ্টে স্বষ্টে তাদের দিন কাটত। আগের দিন রমা পৈতে বেচতে যায় দুপুরবেলা আর আসেনি বাড়ীতে। যখন রাত দশটাতেও রমার কোন খবর পাওয়া যায় নি তখন বৃদ্ধা থানাতে খবর দেয়। আজ মৃতদেহের খবর পেয়ে তার মায়ের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং এখানে এসে মেয়েকে মৃত অবস্থায় পায়। আবার বৃদ্ধা কেঁদে উঠল—একি হল বড়বাবু, রমার কাপড় জামাই বা কে নিল? কে রমার এ রকম অবস্থা করল। রমার নীল ডুরে শাড়ীটা কোথায় গেল? কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধা অজ্ঞান হয়ে যায় আবার খানিকপরে জ্ঞান হলে কাঁদতে থাকে।

চ্যাটার্জি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি উদাস, অনেক দূরে গঙ্গার দিকে চেয়ে গভীর ভাবে কোন চিন্তায় মগ্ন সে।

ঘোষাল কেবল মাঝে মাঝে রাধামাধব, রাধামাধব বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে আর বিরাট জনতা পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে আছে। বড়বাবু তাঁর কাজ করে চলেছেন। তিনি ঘটনা স্থলের আস পাস ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। এতক্ষণে আকাশের মেঘ দূরে সরে গেছে। বেশ ভাল ভাবে রোদ উঠেছে। মৃতের দুটো হাত বেশ শক্ত ভাবে মুঠো করে আছে। যে বস্তার মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গেল সেটা একটা সাধারণ ধান চালের বস্তা তার কারণ এই বস্তার গায়ে কয়েকটা ধান তখনও লেগে আছে। বস্তাটা একটা মোটা পাটের সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল। বড়বাবু এ সমস্ত সাক্ষীদের সামনে নিলেন। তারপহ লাস চেরাই করবার জন্যে পাঠালেন।

এতক্ষণ সেই বৃদ্ধা নীরবে কাদছিল কিন্তু এখন যেই তার মেয়েকে ঐস্থান থেকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ হল সে "ওরে রমারে, আমি তোকে ছেড়ে কি করে থাকব বল রে?" বলে আর্তনাদ করে উঠল। সেই

চীৎকারের প্রতিধ্বনি সকালের আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে ফেলল।

চ্যাটার্জি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে রইল। জনতার মধ্যে অনেকেরই নাকের ফোঁস ফোঁস শব্দ পাওয়া গেল।

ঘোষাল চিৎকার করে বললে—রাধামাধব, হত্যাকারীকে শাস্তি দাও, সে যেন ধ্বংস হয়। বড়বাবু সমস্ত খুটিয়ে দেখার পব উপস্থিত জনতাব মধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাদেব জবানবন্দীও নিয়ে নিলেন। মেয়েটির মাকে তিনি আগেই জিজ্ঞেস করেছিলেন। এইবার চ্যাটার্জি, ঘোষাল আর অন্য কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। চ্যাটার্জি ছাড়া আর কেউ কিছু বলতে পাবল না কারণ চ্যাটার্জিই সব প্রথম দেখেছিল। ঘটনা স্থল থেকে দক্ষিণ দিকে পুরাণ ইটখোলা পর্য্যন্ত ভেজা মাটিতে কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া গেল কিন্তু সেই ছাপগুলো পবীক্ষার উপযুক্ত নয়।

সকলে তখন ঘটনাস্থল থেকে ফেরবার উপক্রম করল। এই সময় আবার সেই বৃদ্ধা চিৎকাব করে কাঁদতে লাগল।

ঘোষাল জনতাকে উদ্দেশ করে বলল—যেমন করেই হোক এই খুনের কিনারা করতে হবে। এই নৃশংস হত্যাকারী কে তা আমরা জানতে চাই। আমরা অপরাধীর বিচার চাই। এই অসহায়া বৃদ্ধার চোখের জলের প্রতিটি বিন্দু যেন সেই অপরাধীকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে।

সমবেত জনতাও ঘোষালের এই উক্তিকে অনুমোদন করে চিৎকার করে বললে—আমরা এই হত্যাকারীর শাস্তি চাই।

বৃদ্ধা এই সমবেত জনতার একসঙ্গে চিৎকারে কিছুটা স্তম্ভিতা হযে রইল। লোকের ভীড় কমতে লাগল। জনতার ভেতর থেকে কয়েকটি স্ত্রীলোক বৃদ্ধাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে লাগল। বৃদ্ধা যন্ত্রচালিতের মত চলতে লাগল। তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল।

জনতার কাছ থেকে চাঁদা তুলে বার টাকা বৃদ্ধার হাতে দেওয়া হল তার সাহায্যের জন্যে। ভীড় পাতলা হয়ে গেল কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে লোকেরা বিভিন্ন স্থানে মণ্ডলাকার হয়ে ঘটনার বিষয় আলোচনা

করতে রইল।

ঘোষালের পীড়াপিড়িতে, বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্বেও বড়বাবু ঘোষালের বাড়ীতে গেলেন এবং সামান্য জলযোগ করলেন। তারপর সেখান থেকে যাবার সময় ঘোষাল বড়বাবুকে অনুরোধ করলেন যাতে তদন্ত একটু ভালভাবে হয় আর প্রকৃত অপরাধীকে ধরা হয়।

বড়বাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে নমস্কার করে চলে গেলেন।

একমাস হয়ে গেল খুনের কোন কিনারা হল না। এত বড় একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রথমে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এখন সে উত্তেজনা আর নেই। ঘটনার পরে কিছুদিন পর্যন্ত সকলের মুখে মুখে এই খুনের কথা শোনা যেত। সন্ধ্যের পর কিছুদিন লোকে বড় একটা বাইরে যেত না। কম বয়সী মেয়েরা ত ভয়ে একেবারে আড়ষ্ঠ। মাঝে মাঝে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ত যে কুলতলার মাঠে একদিন সন্ধ্যে-বেলায় কে যেন কাকে ছোরা নিয়ে ছুটে যেতে দেখেছে। কেউ বলত দোলমঞ্চের পাশে চালতাবাগানে একদিন কতকগুলো অচেনা মুখ দেখা গেছে। তাদের কাছে সিল্কের দড়ি ছিল। এই রকম এক একটা গুজব রটে আর সব ভয়ে হাত, পা গুটিয়ে থাকে। সন্ধ্যের পর গ্রামটা একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে।

মানুষের স্মৃতি-শক্তি বড় দুর্বল। এত বড় একটা ঘটনা আর সেই কারণে যে আশঙ্কা তাও যেন ধীরে ধীরে লোকে ভুলতে লাগল। এখন আর সেই অজানা আশঙ্কা মানুষকে ভাবিত করে তোলে না। আবার দেখা গেল আগেকার মত সবাই যে যার কাজে যাওয়া আসা করছে। বোসেদের সেই ষোল সতের বছরের মেয়েটা আবার অনেক রাত্তির পর্যন্ত বাইরে ঘোরে। এই মেয়েটার নামে কত কুৎসাই না প্রচার হয়েছিল। সে দুশ্চরিত্রা, অপর বাড়ীর ছেলের সঙ্গে নির্জনে ঘোরা ফেরা করে। সেও কিছুদিন ঘরের বাইরে বের হত না সন্ধ্যের পর।

খুনের কথা এখন আর বিশেষ আলোচনা হয় না।

ইতিমধ্যে গ্রামের লোকের অনুরোধে ঘোষাল রমার মাকে মাসে মাসে দশ টাকা দেবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর অগ্রিম দশ টাকা তার হাতে দিয়েছে। সকলেই ঘোষালের এই বদান্যতায় অত্যন্ত খুশী হয়েছে আর রমার মা অশ্রুসিক্ত চোখে ঘোষালকে আশীর্বাদ করেছে।

বড়বাবু এর মাঝে আরো দু'বার তদন্তে এসেছিলেন এবং এই দুদিনই ঘোষালের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ঘোষাল বেশ আগ্রহভরে বড়বাবুকে আদর অভ্যর্থনা করতে কোন ত্রুটী করে নি। প্রতিবারই ঘোষাল বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করেছে খুনের কোন কিনারা হয়েছে কি না। কিন্তু বড়বাবু ওকে হতাশ করেছেন। ঘোষাল আপশোষ করে বলেছে বাধাগোবর এখনও খুনের কোন কিনারা হল না। একটা কিনারা করে দাও।

দ্বিতীয় বার তদন্ত করে চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন বড়বাবু বা থানার অন্য কেউ সেখানে আসে নি। লোকে পুলিশের অকৃত-কার্যতার নানা প্রকার সমালোচনা, টিকাটিপ্পনি করতে লাগল।

কারও কুৎসা রটনা বড় মুখ রোচক। এতে কারও কখনও অরুচি হয় না। মস্তিষ্কের উর্বরতা নানা ভাবে প্রকাশ পায় কুৎসা রটনার সময়। গ্রামের লোকেরা এখন অবসর পেলেই পুলিশের কাজের সমালোচনা করতে বসে যায়। তাদের ত একটা কাজ চাই। একটা না একটা নতুন বিষয় বস্তুর অবতারণার প্রয়োজন। মানুষ একঘেয়ে জীবন যাপন করতে পারে না। তার চাই নতুনত্ব। তাই আজ গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর—অর্থাৎ যাদের কোন বিশেষ কাজ কর্ম নেই—কেবল তাস, দাবা, পাশা প্রভৃতি খেলে সময় কাটে আর মিথ্যা কে সত্য বলে শপথ করতে দ্বিধা করে না—ঘোষালের কাছে এসে অভিযোগ করল যে এত বড় একটা খুনের ব্যাপার যেন ধামাচাপা পড়ে গেল। এভাবে চুপ করে থাকলে চলবে না। ঘুষখোর পুলিশকে কোন বিশ্বাস নেই।

ঘোষাল তাদের কথা মনদিয়ে শুনে বললে—আমারও তাই মনে হয়।

আমিও কদিন ধরে ভাবছি কি করা যায়।

মাতব্বরেরা তখন দ্বিগুন উৎসাহ আর উত্তেজনার সঙ্গে বললে—আমরা ভালভাবে তদন্ত চাই। এ তদন্ত তদন্তই নয়। ভাল গোয়েন্দা দিয়ে তদন্ত করাতে হবে। আমরা একটা মিটিং করে সেখানে জনমত গড়ে তুলতে চাই এবং এই প্রস্তাব সকলের সামনে রাখতে চাই। সরকার ঘুমিয়ে আছে তাকে সজাগ করতে হবে।

ঘোষাল এর আগে উত্তেজনার মাঝে পুলিশের কাজের সমালোচনা করেছে ঠিক কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে যোগ দেবার ইচ্ছে তার ছিল না। সেই কারণে সে বিশেষ হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না।

তখন মাতব্বরেরা "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে অনুমান করল যে ঘোষালের মত আছে। তারা বেশ খুশী হয়ে বলে গেল—পরের রবিবার দোলমঞ্চের মাঠে সভা হবে, আপনাকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

ঘোষাল একবার বললে—আমাকে আবার কেন?

না, আপনাকে যেতেই হবে। আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব—এই বলে ঘোষালকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তারা চলে গেল। যাবার সময় মাতব্বর মধ্যে একজন যে নিজেকে দলপতি মনে করে বলতে বলতে গেল—হাঁ বাবা, সরকারকে দেখাতে হবে যে আমরা মরে নেই, আমরা বেঁচে আছি। এই সভাতেই একটা সিদ্ধান্ত পাকা করতে হবে। কি বলহে—বলে তার সঙ্গীদের দিকে একবার চেয়ে হাসতে হাসতে চলতে রইল। ঘোষাল স্থির হয়ে তাদের যাবার পথে চেয়ে রইল।

পরের রবিবার এক বিরাট সভার আয়োজন হল দোলমঞ্চের মাঠে। বেশ লোক সমাগম হয়েছে। কেউ এসেছে কিছু বলবার জন্যে, কেউ এসেছে মজা দেখবার জন্যেও। ঘোষালকে মাতব্বররা সভাপতি করার জন্যে ঠিক সময় মত নিয়ে এসেছে। চ্যাটার্জি এসেছে আর গ্রামের অনেকেই এসেছে।

যথা সময়ে সভার কাজ আরম্ভ হল। অনেকে পুলিশের কাজের সমালোচনা করে কঠোর ভাবে পুলিশকে আক্রমণ করল। আক্রমণের সময় আর মাত্রাবোধ থাকে না। পূর্বপরিকল্পিত না হলেও আলোচনায় অনেক অবান্তর বিষয় এসে পড়ে। পুলিশের কাজের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকে ব্যক্তিগত আক্রমণ আরম্ভ করল। এই আলোচনায় লক্ষ্য করা গেল যারা সমাজবিরোধী হিসেবে পরিচিত তারা বিশেষ অংশ গ্রহণ করল। এই অংশ গ্রহণ কারীদের মধ্যে দেখা গেল যারা মদ চোলাই করে ধরা পড়েছিল, যারা ওয়াগন ভাঙ্গায় সক্রিয় সহযোগিতা করে এই সমস্ত লোকদের। সভায় পুলিশের বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে ওঠার মত হল।

এই সময় ঘোষাল উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে হাততালি পড়তে লাগল। ঘোষাল বলল—উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাবৃন্দ।

আজ আমরা সমবেত হয়েছি একটা দারুণ সমস্যা নিয়ে। আজ আমাদের সমাজে বড় বিপদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের ধন, প্রাণ, মান সম্ভ্রম এখন রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছে। আপনারা সকলে জানেন আজ মাসাধিক কাল অতিবাহিত হয়েছে। আমাদের এই শান্তিময় পরিবেশ কলুষিত করেছে এক অজানা দুস্কৃতকারী। অতি নৃশংসভাবে হত্যা করেছে আমাদেরই এক পরিচিতা বালিকাকে। এই হত্যার ফলে জনসাধারণের মনে যে সন্ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে তা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। বাড়ীর মা, বোনেরা নির্ভয়ে ঘরের বাইরে বেরতে পারে না, ভাই বন্ধুরা স্বচ্ছন্দে নিজেদের কাজে যেতে পারে না। যতদিন না এই খুনের কিনারা হয় ততদিন এই আশঙ্কা থাকবে লোকের মনে

এইখানে ঘোষালের গলার স্বরটা একটু ভারি হয়ে এল। সমবেত জনতার মধ্যেও একটা দুঃখব্যঞ্জক ধ্বনি শোনা গেল। ঘোষাল আবার আরম্ভ করল—"দুর্ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটে থাকে, ঘটবেও, তবে তার প্রতিকার দরকার। আমাদের সকলের মধ্যে নিরাপত্তার যে অভাববোধ জেগেছে তা দূর করা সরকারের কর্তব্য। আমরা দিনের পর দিন

উদ্‌গ্রীব হয়ে সরকারের মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি। কিন্তু এখনও এ নৃশংশ হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয় নি। যে দুষ্কৃতকারীর হাতে রমা তার জীবন বিসর্জন দিয়েছে তার হাতে যে আরও অনেক নিষ্পাপ প্রাণ বিনষ্ট হবে না তার নিশ্চয়তা কি ? কিন্তু কেবল পুলিশের কাজের নিন্দা বা পুলিশের ওপর কেবল দোষারোপ করলেই ত চলবে না। পুলিশের কাজে সহায়তা করাও আমাদের কর্তব্য। এ ধারণা যেন কার মনে না হয় যে আমরা এখানে পুলিশের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে সমবেত হয়েছি।”

জনতার ভেতর থেকে কয়েকজন চিৎকার করে উঠল “আমরা প্রতিকার চাই।” সেই সুরে সুর মিলিয়ে অনেকে চেচিয়ে উঠল—আমরা প্রতিকার চাই, আমরা প্রতিকার চাই।”

দুই হাত ওপরে তুলে ঘোষাল জনতাকে থামতে অনুরোধ করে আবার আরম্ভ করল— ভাই সব আমাদের উত্তেজিত হলে চলবে না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য প্রতিকার। পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রতিকার পেতে হলে পুলিসের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের ভালভাবে সবদিক বিবেচনা করে এগোতে হবে। একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদ করা খুব সহজ কাজ নয়। তাই আমার মত এই যে আমরা সকলে মিলিত হয়ে সরকারকে অনুরোধ জানাই যেন এই রহস্যময় খুনের তদন্ত বিচক্ষণ অফিসারকে দিয়ে করান হয় আর সরকার সেই সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

এই পর্যন্ত বক্তৃতা করে ঘোষাল তার চোখ থেকে চশমাটা খুলে সামনের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল তারপর চশমার কাঁচটা রুমালে মুছে পরিষ্কার করে আবার চোখে লাগিয়ে বলতে লাগল—ভাইসব আপনারা যদি আমার সঙ্গে একমত হন তাহলে হাত তুলে আপনাদের সম্মতি জানান।”

সকলে তখন হাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল—হ্যাঁ আমরা একমত, আমরা একমত।”

স্মিতহাস্যে ঘোষাল তখন বললে—আমি জানি আপনারা একমত হবেন। আমাদের আজকের এই প্রস্তাব যাতে অতিশীঘ্র সরকারের কাছে পৌছায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে আর আমরা এ কথাও জানাব যে আমরা সব রকম ভাবে সরকারের সহযোগীতা করব।

সাধু সাধু রবের মধ্যে সভা তখন শেষ হল আর যে যার নিজ নিজ বাড়ীতে বা কর্মস্থলে যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। অনেকে চলতে সুরু করেছে। অনেকে চেনা পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে ভীড় ঠেলে চলছে এমন সময় মঞ্চের দিক থেকে একটা গোলমালের শব্দে সকলে সেই দিকে চেয়ে দেখল। প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না কেবল কয়েকজনের একসঙ্গে চিৎকার—জল, জল, পাখা কই, বাতাস কর ইত্যাদি। যারা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে এল। যারা কাছে ছিল তারা তাড়াতাড়ি মঞ্চের দিকে ছুটে গেল। জানা গেল যে বক্তৃতা শেষ করে বসবার সময় ঘোষাল হঠাৎ বুকে ব্যথা করছে বলে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। চ্যাটার্জি ও অন্যান্য বয়ঃজ্যেষ্ঠ যারা তারা জনতাকে ভীড় না করার জন্যে হাত জোড় করে অনুরোধ করছে।

ঠিক মঞ্চের কাছ থেকে জনতা একটু সরে গেল বটে—কিন্তু সকলেই চক্রকারে এদিক ওদিক করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অনেকে বলতে লাগল যে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ঘোষাল কেমন যেন একটা আঘাত পেয়েছে। যাই যাই করেও যেন সকলে যেতে পাচ্ছে না।

কয়েক মিনিট পরে ঘোষাল একটু সুস্থ হলে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

সবাই একেবারে হতবাক। এমন সুস্থ সবল লোক এত সুন্দর বক্তৃতা দিল আর এই কয়েক মিনিটের মধ্যে এরকম হয়ে গেল! সকলের মুখেই বিস্ময়ের ছাপ।

চেয়ারে বসিয়ে এইভাবে নিয়ে যাবার সময় ঘোষাল বললে—হঠাৎ আমার মাথাটা কেমন ঘুরে এসেছিল। আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি, আমাকে নামিয়ে দিন। কিন্তু যারা নিয়ে যাচ্ছিল তারা ঘোষালের কথায়

রাজি হল না। তাকে সেই ভাবেই তার বাড়ীতে পৌঁছে দিল। চ্যাটার্জি ঘোষালকে বিশ্রাম নেবার জন্যে বলে নীলমণিকে বললে—যাও বসন্ত ডাক্তারকে এখনি ডেকে আন।

নীলমণি সমস্ত ঘটনার কথা শুনে বললে—আমি অত করে বারন করনু যে খারাপ শরীরে যাবার দরকার নেই তাত শুনলে না। গরীবের কথা শুনবে কেন? যাই দেখি বসন্ত ডাক্তারের কাছে—বলে রাগে গজ গজ করতে করতে বেবিয়ে গেল।

ঘোষাল তার ইজি চেয়ারে বসে সারাদিনের ঘটনা মনে মনে ভাবতে লাগল। সে অনুভব করল তার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সে চুপ করে চোখ বুঝে শুয়ে রইল। নীলমণি তার তামাক সেজেই বেখেছিল। ঘোষাল ধীরে ধীরে টানতে লাগল।

মিটিংএর দুদিন পরে ঘোষালের বাইরের ঘরে ঘোষাল একলা বসে একটা বই পড়ছে বিকালে। আজ ঘোষাল অনেকটা ভাল আছে। থানার বডবাবু আজ অনেকদিন পরে দেখা করতে এসেছেন। জনসভায় ঘোষালের বক্তৃতা সম্পর্কে বড়বাবু অনেক আলোচনা করলেন। তিনি আক্ষেপ করলেন যে এতদিন হয়ে গেল এখনও খুনের কোন কিনারা হোল না। তবে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন যে তাঁর বেশ বিশ্বাস যে তিনি খুনের নিশ্চয়ই কিনারা করতে পারবেন। আজ বড়বাবু আলোচনার মাঝে ঘোষালকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, এইখানে বৈষ্ণব কত ঘর বাস কবেন বলতে পারেন যাঁরা গলায় তুলসীর মালা পরেন?

ঘোষাল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—ঠিক কতঘর বা কতজন বৈষ্ণব আছে তা আমি বলতে পারিনা। যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তাহলে আমি খবর করে বলতে পারি। কিন্তু কেন? আপনার এতে কি প্রয়োজন?

—দেখুন আমার তদন্তে যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে আমার মনে হয় এমন কোন লোক রমাকে হত্যা করেছে যে বৈষ্ণব অথবা তুলসীর মালা গলায় পরত। আর এও প্রমান পাওয়া গেছে যে খুনী রমাকে তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ধর্ষণ করেছিল।

বড়বাবুর এই জবাব শুনে ঘোষাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তার সুদূর প্রসারী দৃষ্টি থেকে মনে হয় যেন তার মন অনেকদূরে কোন অজানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়বাবু ঘোষালের এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। ঘোষাল আবার বাস্তব জগতে ফিরে এসে একবার বড়বাবুর দিকে চেয়ে বলল—তাহলে খবর নিতে হয় বড়বাবু এখানে বৈষ্ণব কত আছে। আচ্ছা আপনি বললেন যে রমাকে যে খুন করেছে সে খুনের আগে বা পরে তাকে ধর্ষণ করেছে। তার কি কোন প্রমাণ আপনি পেয়েছেন ?

বড়বাবু বেশ জোরের সঙ্গে বললেন—নিশ্চয়ই। বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষায় সেই অভিমতই পাওয়া গেছে আর এও ঠিক যে আসামী একটি সাধারণ লোক নয় তার শিক্ষা আছে ভাল।

—কেন ? কি দিয়ে বুঝলেন ?

—এই যেমন মনে করুন মৃতের কাপড়জামা সরিয়ে রাখা। এটা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে।

—কি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

—যেমন মনে করুন রমার সনাক্তকরণ যাতে সহজে না হয়। আর পরণের কাপড় জামা থেকে অন্য কোন রকম প্রমাণও পাওয়া যেতে পারে।

—তা ঠিক। আপনার ধারণা অমূলক নয়। খুবই সম্ভব।

ঘোষাল আবার চুপ করে রইল। তাকে বড় ক্লান্ত বলে বোধ হতে লাগল। ঘোষাল নিজেও একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

বড়বাবু ঘোষালের অসুস্থতার কথা আগেই শুনেছিলেন। তাই তিনি ঘোষালকে বললেন—আপনাকে আজ বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছে। আপনি বিশ্রাম করুন আমি আপনাকে আর অযথা বিরক্ত করব না।

আপনি এই অঞ্চলের বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি। গোপনে যদি আপনি একটু খবর করেন তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। আমি আজ আসি। আমাকে আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে, এই খুনের ব্যাপারে আর একটা খবর আজ পেয়েছি।

ঘোষাল বেশ খুশীভাবে জিজ্ঞেস করল—কৈ ? এতক্ষণত বলেননি। বাঃ বেশ বেশ। পাকা খবর নিশ্চয়ই।

বড়বাবু একটু হেসে উত্তর দিলেন—হ্যা প্রায় সেই রকমই। শীঘ্রই জানতে পারবেন—বলে আর অপেক্ষা না করে একটা নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

ঘোষাল বড়বাবুর গতিপথে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে বড়বাবুর অপসৃয়মান দীর্ঘ ছায়া ধীরে ধীরে দূর হতে দূরে সরে গেল।

বড়বাবু চলে যাবার পর ঘোষাল চেয়ার ছেড়ে উঠল। বইটা টেবিলের ওপর রেখে বেশ চিন্তিত মনে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল।

নীলমণি এসে ঘরে সন্ধ্যে দেখিয়ে গেল। তারপর ঘোষালের তামাক ধরিয়ে দিয়ে গেল। ঘোষালের একেবারে হুঁস নেই। সে তন্ময় হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। নীলমণি ঘোষালকে ডাকল না। সে জানত ঘোষাল যখন এইভাবে পায়চারী করে তখন সে কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। ঐ সময়ে তাকে বিরক্ত করা সে পছন্দ করে না। নীলমণি অন্য কাজে ভেতরে চলে গেল।

বেশ খানিকটা পায়চারী করার পর ঘোষাল থামল। একবার জানলা দিয়ে বাইরে দেখল তারপর তার ড্রয়ার থেকে একটা টর্চ আর শিংএর উপর ঝোলান লাঠিটা নিয়ে ঘরের পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল আর দরজাটা বাইরের থেকে বন্ধ করে দিল।

এই রাস্তাটা সোজা ঘোষালের পুরাণ ইটখোলার সামনে গিয়ে পড়েছে। যখন ইটখোলা প্রথম আরম্ভ হয় তখন এই রাস্তাটির ব্যবহার হত খুব বেশী। যত লোকজন এই রাস্তা দিয়েই আসা যাওয়া করত।

ইটখোলা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তাটার ব্যবহারও কমে গেছে। এখন এটা মাঝে মাঝে ব্যবহার হয়। অব্যবহারের জন্যে এই রাস্তার দুধারে ঝোপঝাড় বেশ বড় হয়ে গেছে। আগেকার সেই চওড়া রাস্তা এখন সঙ্কীর্ণ হতে হতে প্রায় একটা সরু পায়ে হাঁটা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। এ রাস্তায় কখনও কখনও ঘোষাল বা নীলমণি এসে থাকে। এই রাস্তাটা বেশ নির্জন। এ রাস্তায় ঘোষালের কর্মচারীদের আসবার কোন কারণ নেই। ঘোষাল একবার দেখে নিল তার টর্চ ঠিক আছে কিনা তারপর আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে চলল। এই রাস্তা দিয়ে ঘোষাল অনেকদিন যায় নি। বঁইচ কাটার গাছগুলো এই কয় বছরে বেশ বেড়ে গেছে। চলতে গেলে প্রায় রাস্তার দুধার থেকেই গায়ে এসে লাগে। ঘাসগুলোও বেশ বড় বড় হয়েছে। হাঁটতে গেলে পা ঘাসের মধ্যে ডুবে যায়। উমার হাত ধরে এই রাস্তা দিয়ে সে কত যাওয়া আসা করেছে। সাত আট বছরের মেয়ে দৌড়ে দৌড়ে এই রাস্তা দিয়ে যখন চলত সে চেয়ে থাকত মেয়ের দিকে। নাঃ আজ সব অতীতের অস্ত অন্ধকারে ডুবে গেছে। ঘোষাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাঁটতে, হাঁটতে ঘোষাল তার পুরাণ ইটখোলায় এসে পড়ল। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। সে ধীরে ধীরে পাড় বেয়ে নীচে নামতে লাগল। জলেব কাছাকাছি গিয়ে একবাব দাঁড়াল। জলাশয়ের পাড়ের নীচে বেশ অন্ধকার। ঘোষাল টর্চ জ্বেলে কি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর সে সোজা এগিয়ে চলল জলের কিনারা ধরে।

হঠাৎ মনে হল কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। সে সভয়ে পেছন দিকে তাকাল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। আবার খানিকটা এগিয়ে গেল। এইবার সে থামল। এতক্ষণে যথার্থ সন্ধ্যা নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। একটা বন্য গাছের ঝোপের কাছে টর্চ জ্বেলে ঘোষাল কি দেখল তারপর আগেকার পথ ধরে টর্চ নিভিয়ে সে তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠতে লাগল।

এখানকার সমস্ত রাস্তা ঘোষালের মুখস্ত। ভিজে মাটিতে ঝোপ ঝাড় বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে। অনেকদিন পরে ঘোষাল তার পরিচিত

গাছের গন্ধ পেল। একসময় ঘোষাল এই গন্ধ পেয়ে বলতে পারত কি-গাছ সেখানে আছে। আজ তার বেশী করে ঘেঁটুফুলের গন্ধ নাকে আসতে লাগল। মাঝে মাঝে দু'একটা শিয়াল অতি দ্রুত ঝোপের মধ্যে আসা যাওয়া করছে। এই অসময়ে তাদের রাজত্বে মানুষের প্রবেশ তাদের পছন্দ নয়। ইটখোলার দক্ষিণ পাড়ে একটা বড় বটগাছের ডালে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। কি কর্কশ আওয়াজ! ঘোষাল বেশ সাহসী পুরুষ কিন্তু আজ তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কই এরকমত তার কোনদিন হয় না! অতি ত্রস্তভাবে পাড়ে উঠে পড়ল। পাড়ে উঠে দূরে বাড়ীর আলো দেখতে পেয়ে তার মনে একটু ভরসা এল। সে ত্বরিতগতিতে সদর রাস্তা দিয়ে তার বাড়ীর পথে চলতে লাগল।

ঘোষালের মনে রাজ্যের চিন্তা এসে জটবেঁধেছে। এচিন্তার কোন সুরু নেই কোন শেষ নেই। তার মনে পড়ল তার জীবনের প্রথম-দিনগুলির কথা, তার স্ত্রী ও মেয়ে উমার কথা। তার মন জন্ম মৃত্যুর রহস্যের মধ্যে ডুবে গেল। এই তন্ময়ভাবমধ্যেই সে নিজের বাড়ীতে এসে গেল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একটা বিরাট বারান্দা তারপর তার ঘর। ঘোষাল বারান্দায় উঠতেই দেখল কে যেন তার ঘরে বসে আছে। ঘরে ঢুকে আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল থানার বড়বাবুকে দেখে।

ঘোষাল তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার? আরও কিছু নতুন খবর আছে নাকি? এই বলে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

বড়বাবু শান্তভাবে জবাব দিলেন—না অন্য কোন বিশেষ খবর নয়। একটা বিষয়ে আপনাকে একটু সাবধান করে দিতে এলাম।

ঘোষাল বড়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল বড়বাবু কি বলবেন শোনার জন্যে। বড়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আপনার এখান থেকে সাইকেলে ফেরার সময় আমি আপনার পুরাণ ইটখোলার ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুদূর যাবার পর আমার মনে পড়ল, যে ব্যাপারে আমি তদন্তে যাচ্ছিলাম তার বিষয়ে একটা জরুরী

কাগজ আমি থানায় ফেলে এসেছি তাই আমি ফিরে আসছিলাম। আসবার সময় আমি একটা টর্চের আলো জ্বেলে একজনকে আপনার ঐ ইটখোলার মধ্যে কিছু খোঁজাখুজি করতে দেখেছি। আমি একলা থাকায় আর ওখানে না গিয়ে আপনাকে খবরটা দিতে এলাম। এসে দেখি আপনি নেই আর আপনি কোথায় গেছেন তা কেউ বলতে পারল না। আমি অনুমান করলাম যে আপনি কাছেই কোথাও গেছেন। তাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

বড়বাবুর মুখের কথা শুনে ঘোষালের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত ক্ষণকালের জন্য সরে গেল। ঘোষাল যে চেয়ারে বসেছিল তারি ওপর হেলান দিয়ে বসে রইল।

বড়বাবু একদৃষ্টে ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ঘোষাল যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় একবার কেসে গলাটা পরিষ্কার করল তারপর হঠাৎ জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—আপনি লোকটাকে চিনতে পারেন নি ?

এই প্রশ্নের উত্তর সোজা ভাবে না দিয়ে বড়বাবু বললেন—মনে হল লোকটার হাতে একটা লাঠি আর একটা টর্চ ছিল।

কিছুক্ষণ সমস্ত চুপচাপ। ঘোষাল রাস্তার দিকে চেয়ে আছে আর বড়বাবু একদৃষ্টে চেয়ে আছেন ঘোষালের মুখের দিকে।

এইভাবে কয়েক সেকেণ্ড থাকার পর ঘোষাল হঠাৎ বলে উঠল—আপনি লোকটাকে দেখেও তাকে ধরার কোন চেষ্টা করলেন না। কে জানে সেই হয়ত খুনী।

বড়বাবু একটা 'হুঁ' শব্দ করলেন মুখে আর বললেন—দেখুন আসল খুনী যে সে পালাতে পারবে না। আমার বেশ মনে হচ্ছে যে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আসামীকে এখানে হাজির করতে পারব। যাইহোক আপনি সাবধানে থাকবেন। সন্ধ্যায় পর বা রাত্রির অন্ধকারে একলা কোথাও যাবেন না। আমার সন্দেহ হয় খুনী কাছাকাছি কোথাও আছে আর আমাদের যাবতায় কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছে। বড়বাবুর কথায় তাৎপর্য ঘোষাল ঠিক বুঝতে পারল না।

সে একটা বিমূঢ় দৃষ্টিতে বড়বাবুর কথার মানে খুঁজতে লাগল। বড়বাবু একটা নমস্কার করে প্রস্থান করলেন। বড়বাবুর পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল। ঘোষাল অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে বসে রইল।

দুদিন রাত্রে ঘোষালের ভাল ঘুম হচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করে সে ঘুমবার জন্যে কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। অনেক রাত্রে একটু তন্দ্রা আসে সেইকারণে তার বিছানা থেকে উঠতে দেরী হয়ে যায়। ভাল ঘুম না হওয়াতে মনটাও তার আজকাল ভাল থাকে না। সকালে উঠতে দেরী হয় বলে আজ দুদিন তার প্রাতর্ভ্রমনে যাওয়া হচ্ছে না। আর গঙ্গাস্নানও হয় না। এই দুদিন সকালে ঘোষালকে না দেখে চাটার্জি আজ সকালে ঘোষালকে দেখতে এল। মিটিংএর শেষে ঘোষাল অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার পর আর চ্যাটার্জি ঘোষালকে দেখতে যেতে পারে নি। চ্যাটার্জি একটা সাংসারিক কাজের জন্যে বাইরে গিয়েছিল। সে রোজ সকালে যেত আর রাত্রে ফিরত। এ কদিন খুব ব্যস্ত ছিল।

আজ চ্যাটার্জি দেখল ঘোষাল বেশ অসুস্থ। কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে ঘোষাল বললে—এমনি ভালই আছি তবে ঐ মিটিংএর দিন থেকে রাত্রে ভাল করে ঘুম হয় না। সব সময় মাথাটা ধরে থাকে। একটা অস্বস্তির ভাব সব সময় রয়েছে।

চ্যাটার্জি তাকে আবার নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণ ও গঙ্গাস্নান আরম্ভ করতে বলল। আর একথা জোর দিয়ে বললে যে গঙ্গাস্নানে তার সমস্ত উপসর্গ দূর হবে।

ঘোষাল চ্যাটার্জির দিকে চেয়ে বলল আমিও তাই ভাবছি। আবার আগেকার মত রোজ সকালে বেড়াব আর গঙ্গাস্নান করব।

তারপর দুজনে কিছুক্ষণ সাধারণ আলোচনার পর চ্যাটার্জি বিদায়

নিল। ঘোষাল আবার একলা হ'ল।

ঐদিন অধিক রাত পর্যন্ত ঘোষাল মোটেই ঘুমতে পারল না। সে যতই ঘুমবার জন্যে চেষ্টা ক'রে চোখ বুজে শুয়ে থাকে তার কেবলই মনে হয় কে যেন তার ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে। যে পাশে শব্দ হয় সে পাশ থেকে ঘোষাল অন্য পাশে ফিরে শোয়। শব্দ আবার সেই পাশে যায়। বিরক্ত হয়ে ঘোষাল উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। তাতেও নিস্তার নেই। শব্দ ঠিক কানে আসতে থাকে। সে ভাবতে থাকে একি উৎপাত। কই এরকম ত তার আগে কোনদিন হয় নি? সে সমস্ত শরীর চাদরে ঢাকা দিল। কিন্তু কই শব্দটাত থামে না। ঘোষাল জোর করে দুই কাণ দুহাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে রইল। নাঃ, তখনও সেই চলে বেড়াবার শব্দ। এইবার ঘোষালের মনে একটু ভয় হল। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। তার মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল; বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। মনে মনে ভাবল যে তার বায়ুবৃদ্ধির জন্যে এইরকম হয়েছে। উঠে আলো জ্বালল। চারিদিকে ভাল করে দেখল। কই কোথাও ত কিছু নেই। একবার তার মনে হল এসমস্তই তার মনের ভুল। কিন্তু এরকম ভুল তার হবে কেন? সেত স্পষ্টই নিজের কানে শব্দ শুনেছে। কই এখনত আর শব্দ পাচ্ছে না। ঠাণ্ডাজলে ভাল করে তার মাথাটা ধুয়ে, গা, হাত পা মুছে ফেলল। তারপর ঘরের মধ্যে অল্প পায়চারী করতে করতে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে একটু শান্তি অনুভব করল। তার মনের ভুল বুঝতে পেরে মনে মনে হাঁসল। আরও একটু পায়চারী করে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। আলো জ্বেলে ঘোষাল শুতে পারে না। এটা তার বহুদিনের অভ্যেস। আলো জ্বেলে শুলে তার মাথা ধরে।

সে হঠাৎ আবার উঠে পড়ল। আলো জ্বেলে খাটেরতলাটা ভাল করে দেখে নিল। তারপর আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। দূরে কারখানায় ঘড়িতে আড়াইটা বাজার শব্দ হল। ঘোষালের

ঘরে বড় ঘড়িটা টিক টিক্ করে সমানে চলেছে। টিক্ টিক্ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষাল এক, দুই, তিন, চার করে মনে মনে গুনতে লাগল। তার চোখ তন্দ্রায় ভারি হয়ে এল। আবার সেই শব্দ। ঘরের মধ্যে আবার সেই চলে বেড়াবার শব্দ। ঘোষাল নিজের মনকে বেশ শক্ত করে ঠিক করল যে আজে বাজে চিন্তা করবে না। কিন্তু মনও আর কথা শোনে না। তার মনে ঘুরে ফিরে সেই আগেকার মত রমার মৃতদেহের কথা আসতে লাগল। তার মনে শত শত বৃশ্চিক দংশন করতে লাগল। ঘোষাল কিছুতে শুতে পারল না। ছট্‌ফট্ করে এপাশ ওপাশ করতে করতে বিরক্ত হয়ে আবার সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। চোখে ঘুম আছে অথচ মনের যাতনায় ঘুমবার উপায় নেই। সে আবার আলো জ্বালল। আবার ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে ঠাণ্ডা জলে তার সমস্ত শরীর মুছে ফেলল। একি যন্ত্রণা তার হয়েছে ? সে সারা ঘরে পায়চারী করতে লাগল। সে অধীর হয়ে উঠল।

বারান্দার দরজা খুলে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল। এই বারান্দা থেকে তার পুরাণ ইটখোলা বেশ ভাল ভাবে দেখা যায়। একবার সেই দিকে তাকিয়ে দেখল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। কিন্তু ও কি ? ঘোষাল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে ভাল করে তার চোখ দুটো রগড়ে নিল। নাঃ সেত ঠিকই দেখছে। একটা আলোর রশ্মি যেন তার সেই পুরাণ ইটখোলার মধ্যে ছোটা ছুটি করতে করতে স্থির হয়ে জলাশয়ের পাশে দাঁড়াল। এত তীব্র রশ্মি। একি আলেয়ার আলো ?

ঘোষাল এক দৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল। দেখতে দেখতে তীব্র আলো একটা ছোট রেখায় পরিণত হল আর তার মাঝে ফুটে উঠল একটি বড় করুণ মুখ। একটি ১৩/১৪ বছরের মেয়ের মূর্তি। সেই মেয়েটি ধীরে ধীরে ইট খোলায় পাড় বেয়ে ওপরে উঠে এল। কিন্তু এ কি ? এযে তার মেয়ে উমা। ওযে কাঁদছে। ঘোষাল সেই দিকে চেয়ে আছে মন্ত্র মুগ্ধের মত। দেখতে দেখতে উমার চেহারা বদলে গেল। উমার জায়গায় কাঁদছে দাঁড়িয়ে রমা। রমা কাঁদতে কাঁদতে

চলল উত্তর দিকে। ঘোষাল তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। হাঁটতে হাঁটতে যেখানে চ্যাটার্জি বস্তার মধ্যে মৃতদেহ দেখেছিল সেইখানে গিয়ে বমা মিলিয়ে গেল।

ঘোষাল আর চেয়ে থাকতে পারল না। তার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছিল। তার মাথার মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। কপালের দুপাশে দুটো শিরা ছিঁড়ে যাবার মত হতে লাগল। ঘোষাল বারান্দায় পড়ে গেল।

ঘোষাল যখন ঘুম ভেঙ্গে উঠল তখন অনেক বেলা হয়েছে। বারান্দায় ঘোষালের মুখে রোদ এসে পড়েছে। ঘোষালের মনে পড়তে লাগল বিগত রাত্রের সমস্ত কাহিনী। তার মাথাটা এখনও ভার হয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। আর শারীরিক অবসাদ তাকে অনেক দিনের অসুখ থেকে ওঠার মত অনুভূতি এনে দিল। তার দেহ এবং মন দুই ই আজ অত্যন্ত অবসন্ন। সেই উদ্যম তার নেই, বয়স তার অনেক বেড়ে গেছে।

আগের দিনের সন্ধ্যায় চাটুয্যের সঙ্গে আলোচনায় সময় সে ঠিক করেছিল যে সে আজ থেকে সকালে বেড়াবে আর গঙ্গাস্নান করবে কিন্তু এত বেলায় বেড়াবার কোন মানে হয় না; বিশেষ করে তার শরীর এত অবসন্ন লাগছে যে সে আজ বাইরে বেরতে পারবে না। আজ সে সত্যিই অসুস্থ।

যখন সে ঘরের বাইরে এল তখন তার চেহারার পরিবর্তন সকলেরই চোখে পড়ল। সমস্ত মুখে তার কালিমার ছাপ। তার নিটোল মুখে এক-রাত্রে ছোট ছোট বলিরেখা দেখা দিয়েছে। তার মেজাজও হয়েছে ভীষণ খিটখিটে। সামনে যাকে দেখছে, কারণে অকারণে খিঁচিয়ে উঠছে তার ওপর। সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করছে তার স্বভাব। যে ঘোষাল সকলের সঙ্গে সৌহার্দের সঙ্গে ব্যবহার করে, আজ তার মুখ দেখলে মনে হয় যেন শ্রাবণের জলভরা কাল মেঘের মত অন্ধকার। কর্মচারীরা সকলেই ভয়ে তটস্থ। কি কারণে কার ওপর কখন ঘোষাল চটে উঠবে সেই ভয়ে সকলেই সাবধানে ঘোষালের নজরের বাইরে থাকার চেষ্টা

করতে লাগল। মুখ ফুটে কারও কিছু বলার সাহস নেই। ঘোষালের এই প্রকার আচরণের জন্যে দু'চারজন কর্মচারী নিজেদের মধ্যে আড়ালে আর ধীরে আলোচনা করতে লাগল।

ঘোষালের অতি বিশ্বাসী চাকর নীলমণি ঘোষালের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে ডাক্তার আনবে কিনা। জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই এক ধমক খেল—কেন ? আমার কি হয়েছে ?

নীলমণি আজ বহু বছর এখানে আছে। সে তত সহজে দমবার পাত্র নয়। সে বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলল—কি হয়েছে কি মুখে বলতে হয় ? কেন চোখে দেখলে বোঝা যায় না। আজ এত বেলায় উঠেছ কেন ? বলি নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখেছ, কি হয়েছে অমন সুন্দর চেহারা ? আমি যাচ্ছি ডাক্তারকে ডাকতে।"

ঘোষাল চুপ করে রইল। অন্য কেউ হলে তাকে ধমকে দেওয়া সোজা কিন্তু নীলমণি এযে তার অভিভাবক ও বটে। সে যে তাকে বড় স্নেহ করে।

নীলমণি ঘোষালের স্বভাব জানে। চুপ করে থাকা মানে যে সম্মতি দেওয়া তাও তার বুঝতে কোন অসুবিধে হল না। সে আর সময় নষ্ট করল না। ঘোষালের স্নানের জল, তামাক সমস্ত ঠিক করে বেরিয়ে পড়ল।

ঘোষাল আজ বড় অন্যমনস্ক। সে চুপ করে তার ইজিচেয়ারে শুয়ে ভাবতে রইল যে এ ব্যাধি বোধ হয় স্বয়ং ধন্বন্তরী আসলেও সারাতে পারবে না। এ ব্যাধি তার জীবনের সাথী হয়ে রইল। আগের রাতের সমস্ত ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল মেয়ে উমার মুখ। বড় করুণ বলে মনে হয়েছিল তার। তাকে কি বলতে চাইছিল উমা কিন্তু সেই সময় সেখানে ফুটে উঠল আর একটা করুণ মুখ রমার। আর চিন্তায় খেই হারিয়ে গেল। ঘোষাল উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি তার শোবার ঘরে গিয়ে উমার ফটো যেখানে আছে সেখানে দাঁড়াল। হ্যাঁ, এই মুখইত সে কাল দেখেছে। তার এতটুকু ভুল হয় নি। উমার মুখ সে কখন ভুলতে পারে না। একবার

বারান্দায় কাছ গিয়ে সে ইটখোলার দিকে চেয়ে রইল। চারিদিকে সূর্য্যের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রোদ্দুর পড়ে যেন ঝকঝক করছে। ঐত ইটখোলার পাড়। অনেক তফাতে ইটখোলার পুকুরের জল সামান্য দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ পাড়ের সেই বট গাছটা সেই ভাবেই আছে।

ঘোষাল বার বার ভাবতে লাগল। কই, দিনের আলোতে কোন ভয় ভাবনা থাকে না? তবে রাতের অন্ধকারে কেন এত দুশ্চিন্তা, কেন এত দুর্ভাবনা। মানুষ অনিশ্চিতকে ভয় করে, ভয় করে অজানাকে। একি তার অন্ধকারকে ভয়? ঘোষাল দুর্বল মনে ভেবে কিছু কিনারা করতে পারল না। সে বাইরের ঘরে গিয়ে আবার বসল। নীলমণি যে তামাক সেজে দিয়েছিল তা পুড়ে গেছে। কয়েকবার টান দিয়ে দেখল যে ধোয়া বেরোয় না। সে রেখে দিল নলটা। কিন্তু এ তার কি হল? এভাবে আর তার কতদিন চলবে? তার মন ডুবে গেল এক বহু পুরাতন স্মৃতির মধ্যে। তার ছেলে বেলার সমস্ত ঘটনা তার মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে আসতে লাগল। তার বাবার কথা মনে হল। অনেক অল্প বয়সে তার বাবা মারা যান। অনেক চেষ্টা করেও সেই মুখটা তার মনে পড়ল না। তার মাকে তার বেশ মনে আছে। বাবার মৃত্যুর পর তাদেব অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়েছিল। কি ভাবে মামাদের সাহায্যে সে মানুষ হয়েছিল তার মা কি কষ্ট করেই না তাকে মানুষ করেছিলেন! ঘোষালের আথিক স্বচ্ছলতা তাব মা দেখে গেছেন বটে তবে আরো কিছুদিন বাঁচলে ভাল হত। মৃত্যুকালে তাঁর এমন কিছু বয়স হয় নি। এই ভাবে ঘোষাল কতক্ষণ যে চিন্তা করতে লাগল তার ঠিক নেই। হঠাৎ সে ভীষণ ভাবে চমকে উঠল "নমস্কার" এই শব্দে।

তার বুকের ভেতরের স্পন্দন বেড়ে উঠল। দরজার দিকে চেয়ে দেখল বসন্ত ডাক্তার দাঁড়িয়ে।

ডাক্তারকে দেখে তার ভাবনা দূর হল বটে কিন্তু তার বুকের ভেতরে হাতুড়ী পেটা বেশ জোরেই চলতে রইল। প্রকৃতিস্থ হতে ঘোষালের বেশ কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল। ধীরে ধীরে স্বভাবিক অবস্থা ফিরে

পেয়ে প্রতি নমস্কার করে ঘোষাল বসন্ত ডাক্তারকে বসতে বলল।

বসন্ত ডাক্তার এ অঞ্চলে সকলকারই পরিচিত। আরও অনেক ডাক্তার আছে এই গ্রামে কিন্তু সবাই হাতুড়ে ডাক্তার। একমাত্র বসন্ত ডাক্তারই এম. বি. পাশ করা ডাক্তার। তার হাত যশও ভাল। এই কারণে তার পশারও খুব বেশী—

বসন্ত ডাক্তার লোকটি মাঝারি বয়সের। সব সময় মুখে হাসি লেগে আছে। তার ওপর রোগীদের অগাধ বিশ্বাস। সকলের ধারণা যে বসন্ত ডাক্তার যদি কোন রোগীকে নিজের হাতে রাখতে না চান তাহলে তার মৃত্যুকে কেউ রুখতে পারবে না। বসন্ত ডাক্তারের একটা মস্ত বড় গুণ এই যে তার টাকার জন্যে কোন জুলুম নেই। সাধারণতঃ দুটাকা করে ফীস সে নিয়ে থাকে কিন্তু যারা গরীব তাদের সে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। কেবল তাই নয় অনেক সময় তার নিজের পয়সা খরচ করে তাদের পথ্যেরও ব্যবস্থা করে। গরীবের কাছে সে টাকা পয়সা পায়না বটে কিন্তু অন্তরিকতা যথেষ্ট পায়।

বসন্ত ডাক্তার সম্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখ তার কম্পাউণ্ডার প্রায়ই করে থাকে। বসন্ত ডাক্তার একবার একটি রুগী দেখে তার প্রেসক্রীপশন করে "দু কাহন খড়"। কম্পাউণ্ডার ভাবল যে ডাক্তার বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে প্রেসক্রীপশন লিখেছে। সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে যে ওষুধটা সে ঠিকমত বুঝতে পারছে না। ডাক্তার তার কম্পাউণ্ডারের মনের কথা বুঝে বললে—আরে লোকটার বুকে পিঠে সর্দ্দি বসেছে। আমি যে ওষুধই দিই না কেন ওর কোনও উপকার হবে না যতক্ষণ না ওর ঘরের চালাটা ছাওয়া হয়। চালে একটি খড় নেই। এই দুর্দ্দান্ত শীতের হিমে ওর কি চিকিৎসা হবে। গরম জামা কাপড়ও নেই। বলা বাহুল্য সেই গরীব রুগীর ঘর ছাওয়াও হয়েছিল আর সেরেও উঠেছিল বসন্ত ডাক্তারের চেষ্টায়। এই সমস্ত নানান কারণে বসন্ত ডাক্তারকে সকলেই চায়।

যখন নীলমণি বসন্ত ডাক্তারের কাছে গেল, তখন সেই ডাক্তার-খানায় দশ বার জন রুগী বসে ছিল। সকলকে দেখে ওষুধ পত্রের

ব্যবস্থা করতে তার কিছুটা দেরী হয়ে গেল। বসন্ত ডাক্তারের সঙ্গে অবশ্য ঘোষালের রোজ দেখা হয় না কিন্তু দিন পনর আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই পনর দিনের মধ্যে ঘোষালের চেহারার বেশ পরিবর্তন ডাক্তারের নজরে পড়ল। সে বিষয়ে কোন কিছু না বলে ডাক্তার, ঘোষালকে জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে আপনার ?"

ঘোষাল খানিকটা চুপ করে থেকে জবাব দিল— দেখুন ডাক্তার বাবু, মাস খানেক আগে এখানে একটা নৃশংশ খুন হয়েছিল তা কি আপনি জানেন ?

ডাক্তার—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই একটা ১৪।১৫ বছরের মেয়ে ত ? সত্যি বড় নির্মম ভাবে মেয়েটাকে হত্যা করা হয়েছিল।

ঘোষাল—হ্যাঁ সেই ব্যাপারে গত রবিবার একটা সভা ডাকা হয়েছিল।

ডাক্তার—হ্যাঁ আমি জানি। আমাকেও ওরা ডেকেছিল কিন্তু আমি কলে বেরিয়ে যাই তাই আসতে পারিনি। কি হল সেই সভায় ?

ঘোষাল—সেই সভায় ওরা আমাকে সভাপতি করেছিল। একটু থেমে আবার বললে—"সেই সভায় বক্তৃতা দেবার পর হঠাৎ আমার মাথাটা ঘোরে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।"

ডাক্তার—তারপর ?

ঘোষাল—অবশ্য কয়েক মিনিট পরে সব ঠিক হয়ে যায় কিন্তু—"

ডাক্তার—কারকে দেখিয়ে ছিলেন ?

ঘোষাল—না। এই সামান্য ব্যাপারে আর কি ডাক্তার ডাকব। কোন ডাক্তার ডাকিনি। তবে দেখছি যে এখন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

ডাক্তার—কি ?

ঘোষাল—আজ কদিন রাতে আমার মোটে ঘুম হচ্ছে না এর জন্যে একটা ভীষণ অবসাদ আর অসুস্থ বোধ করছি; বিশেষ করে কাল রাত্রে আমার বড় কষ্ট গেছে। এই রকম কষ্ট যদি আরও কয়েকদিন

হয় তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। আপনি আমাকে রাতে যাতে ভাল ঘুম হয় এই রকম ওষুধ দিন।

দু চার দিন রাতে ভাল ঘুম না হলে মানুষ কেন পাগল হয়ে যাবে বসন্ত ডাক্তার ঠিক বুঝতে পারল না। সে ভাবল যে তার অভিজ্ঞতায় এ রকম অনেক রুগী সে দেখেছে যারা সামান্য কিছু হলে সেটাকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেখায়। ঘোষালও বোধ হয় সেই পর্য্যায়ের হবে। এ ধরণের রুগী ডাক্তার অনেক দেখেছে। মনে মনে হাসি পেলেও ডাক্তার মুখে কিছু বলল না। ডাক্তার ঘোষালের নাড়ীর স্পন্দন ও রক্তের চাপ ভাল করে পরীক্ষা করল। তার বুক, পিঠ ভাল করে পরীক্ষা করল কিন্তু সাধারণের কোন ব্যতিক্রম দেখতে পেল না।

ডাক্তার ঘোষালকে বললে—আপনার রক্তের চাপে এমন কিছু অস্বাভাবিকতা নেই। কয়েকদিন আপনার পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। এটা একটা সাময়িক অস্বস্তির ভাব এটা দু এক দিনের মধ্যেই চলে যাবে। এই বলে ডাক্তার তার নাম লেখা প্যাড্ বার করে তাতে ওষুধের নাম লিখে দিল। আর ঘোষালের দিকে চেয়ে বললে—এটা একটা ঘুমের ওষুধ। দুটো বড়ির বেশী যেন কোন কারণেই খাবেন না। এতেই আপনার সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রায় ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষাল আবৃত্ত করল—সব ঠিক হয়ে যাবে ?

বসন্ত ডাক্তার বেশ জোরের সঙ্গে বলল—নিশ্চয়ই। সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।"

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে নীলমণিকে ইসারা করল তার সঙ্গে যাবার জন্যে ওষুধ আনতে। "আবার কাল আসব" বলে নমস্কার করে ডাক্তার বেরিয়ে পড়ল। তার পেছনে পেছনে চলল নীলমণি ডাক্তারের ব্যাগ নিয়ে।

রাস্তায় চলতে চলতে ডাক্তার নীলমণিকে জিজ্ঞেস করলে—ওহে নীলমণি, তোমার বাবুকে যেন মনে হল বড় ভেঙ্গে পড়েছেন, কি ব্যাপার হে ?

নীলমণি যেন বেশ চিন্তিত ভাবেই বললে—হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, আমিও তাই ভাবছি। ঐ মেয়েটা খুন হবার পর থেকে বাবু যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছে। আমি বলি কত লোক ত কতখানে খুন হচ্ছে তা এর জন্যে এত কি হতে পারে?

ডাক্তার—তুমি জান না নীলমণি কোন সময় মানুষের মনে কি ভাবে আঘাত লাগে আর সেই আঘাত কত গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। যাই হোক বেশ কিছুদিন তোমার বাবুকে বিশ্রাম নিতে বল। আমার ত মনে হয় দুচার দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই ভাবে ছোট ছোট বিষয়ের আলাপ করতে করতে তারা এসে ডাক্তারের ডিসপেন্সারীতে পোঁছে গেল।

ডাক্তার তাকে ওষুধ দিয়ে বারে বারে বলে দিল যে দুটো বড়ির বেশী যেন কখনও না খায়। দু এক দিনের মধ্যে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। নীলমণি "যে আজ্ঞে" বলে সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ীর পথে রওনা দিল।

সারাদিন ঘোষালের এক রকম কাটল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। আগের রাতের কথা মনে হলেই তার প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। আজ রাত্রে পূর্বরাত্রের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা তাকে অস্থির করে তুলল। একবার ভাবল নীলমণিকে রাত্রে তার ঘরে শোবার জন্যে বলবে কিন্তু পরক্ষণে তার আত্মসম্মানে বাঁধল। মনকে সে এই বলে প্রবোধ দিল যে আজ ত তার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে। আজ আর ভয় কি? রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোবে আর একেবারে সকালে উঠবে। কিন্তু পরক্ষণে তার মনে হল, এই ভাবে ঘুমের ওষুধ খেয়ে সে কি সারা জীবন কাটাবে! দেখা যাক কদিন তাকে এই ভাবে কাটাতে হয়?

রাত্রে ঘোষাল সামান্য আহার করল আর তার পর ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল।

ঘুমের মাঝে স্বপ্নের ঘোরে ঘোষালের মনে হল যেন সে অনেক উঁচু থেকে নীচে পড়ছে। প্রায় মাটিতে পড়ে পড়ে এমন সময় চমকে

উঠে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঠিক তখন দূরে কারখানার ঘড়িতে আড়াইটা বাজার ঘণ্টা বাজল। ঘোষালের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে নিস্তেজের মত শুয়ে একটা কিছুর অপেক্ষা করতে লাগল। পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোথায় ঘুম? একটু চোখ বুজিয়েছে আর ঘরের মধ্যে সেই চলে বেড়াবার শব্দ। ঘোষালের কান সেই শব্দ শোনার জন্যই উৎকর্ণ হয়ে ছিল। আতঙ্কে তার সর্ব শরীর বিবশ হয়ে গেল। সে ঘামতে লাগল। আর স্থির থাকতে না পেরে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। আলো জেলে আজও সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল। কোথাও কিছু নেই। অবসন্ন দেহে সে পূর্বরাত্রির মত ঠাণ্ডাজলে মাথা ও সর্বশরীর ধুয়ে ও মুছে ফেলল। এই ঘরে তার আটত্রিশ বছর কেটে গেছে। তার বহুপুরাতন স্মৃতি মনে পড়তে লাগল। কৈ? কোনদিন ত সে এরকম ভয় পায়নি। একি তার মনের ভুল না কোন অশরীরি আত্মা তাকে তার কৃতকর্মের সাজা দিচ্ছে? ঘোষাল তার মৃত স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে কাতর ভাবে বলতে লাগল—তোমরা আমাকে বাঁচাও; আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

কাতর আবেদনের পর ঘোষাল যেন একটুশক্তি ফিরে পেল তার মনে। সে আবার আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু কৈ? শান্তি কোথায়? আবার ঘরের মধ্যে সেই চলে বেড়াবার শব্দ। ঘোষাল মরিয়া হয়ে উঠল। না, সে কখনই ভয় পাবে না। এ তার মনের ভুল। সে জোর করে শুয়ে রইল। এবার সে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। আর সমস্ত শরীর চাদরে ঢাকা দিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে শব্দের কিন্তু বিরাম নেই। সেটা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। অবসন্ন দেহে ঘুমের আরাধনা করেও ঘোষালের কোন ফল হল না। বিছানা তার কাছে অসহ্য বোধ হতে লাগল। আবার সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিজের অজ্ঞাতসারে বারান্দার সামনে গিয়ে চেয়ে দেখল তার পুরান হাটখোলার দিকে। একি? আবার সেই? আবার সেই আলো? উজ্জ্বল আলো একটি রশ্মির আকার নিল আর তার

মাঝে দাঁড়িয়ে তার উমা অতি করুণভাবে চেয়ে আছে আর কি বলতে চেষ্টা করছে। উমার মুখে দারুণ বেদনার ছাপ। ঘোষাল সেইদিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। দেখতে পেল তার উমা যেন রমায় পরিণত হল আর আগের রাতের মত ধীরে ধীরে ইটখোলার পাড়দিয়ে ওপারে উঠে উত্তর দিকে চলতে চলতে মিলিয়ে গেল। ঘোষালের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে মাতালের মত টলতে টলতে তার খাটের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ঘোষালের সকালে উঠতে অনেক দেরী হল। তার সমস্ত শরীরে ব্যথা মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। নিজের চেহারা আয়নায় দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। একি হল? কোথায় গেল শান্তি? দারুণ আক্ষেপে যে সে কেঁদে ফেলল। কত রকমের চিন্তা তার মনে আসতে লাগল। কি করে সে শান্তি পায়? সুনীল চ্যাটার্জিকে সব কথা খুলে বলবে? না, না তা হয় না। তার মান, সম্মান, সমাজ, এসমস্ত জলাঞ্জলি দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। চাটার্জি হাসবে। তার সম্বন্ধে আলোচনা করবে। না, না, তা কখনও হতে পারে না। তবে বসন্ত ডাক্তারকে বললে কেমন হয়? নাঃ, তাও সম্ভব নয়। তবে সে কি করবে? এই অশান্তির বোঝা মাথায় করে নিয়ে সে কি করে বাঁচবে? এই দুর্দিনে তার শরীর যে রকম খারাপ হয়েছে তাতে এইভাবে আর বাঁচা চলে না।

পরক্ষণে তার আত্মমর্যাদা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। সে নিজের মনকে প্রবোধ দিল—কিসের ভয়? কে আমার কি করতে পারে? আমার অসাধ্য কি? মনকে যতদূর সম্ভব শক্ত করে আর মুখে শান্ত ভাব দিয়ে ঘোষাল বাইরে এল।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঘোষালের চোখের কোলে ঘন কাল দাগ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; তার মুখের বলিরেখাও বেশ ভালভাবে বোঝা যায়।

নীলমণি এবং অন্যান্য কর্মচারীরা আজ ঘোষালের চাল চলনে তাকে বেশ সুস্থ বলে অনুমান করল। ঘোষাল বিশেষ কোন কথা

না বলে সোজা তার অফিস ঘরে গিয়ে বসল। অফিস ঘরে বসলে কি হবে, কাজে মন দেওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব হল না। বসন্ত ডাক্তার আগের দিনের কথা মত যথা সময়ে এসে ঘোষালের সঙ্গে দেখা করল আর আজ ঘোষালকে একটু ভাল বলেই মনে করল। ঘুমের কথা জিজ্ঞেস করতে ঘোষাল বললে যে রাত দুটো পর্যন্ত তার ভালই ঘুম হয়েছে কিন্তু তার পর আর মোটেই ঘুমতে পারিনি। ঘুমের ওষুধ আর বেশী খাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করতে ডাক্তার পরিষ্কার বললে যে একটু রাত করে শুলে আর ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না কিন্তু ঘুমের ওষুধ আবও বেশী মাত্রায় খেলে অপকার হতে পারে।

শরীরের এমনি সাধারণ অবস্থা ভাল দেখে ডাক্তার উঠে দাঁড়াল আর যাবার আগে বলে গেল—"কোন ভয় নেই, ভাববারও কোন কারণ নেই। দু'চার দিন ঘুম না হলে শরীর অবসন্ন বোধ হয়। ও আবার বিশ্রামে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যতই হোক ঘুমের ওষুধ আর বেশী মাত্রায় খাবেন না।"

সারাদিন ঘোষালের বেশ ভালভাবেই কাটল। সন্ধ্যার আগে আজ নীলমণিকে নিয়ে ঘোষাল একটু বেড়াতে বার হল। শরীর দুর্বল হলেও আস্তে আস্তে বেড়াতে বেড়াতে অন্যমনস্ক ভাবে ঘোষাল তার পুরাণ ইটখোলার কাছে এসে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ইটখোলার দিকে চেয়ে থেকে নীলমণিকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা নীলমণি, ইটখোলায় কাউকে দেখতে পাচ্ছ ?

নীলমণি—না বাবু, এদিকটায় বড় কেউ আসে না, এদিকটা বড়, নির্জন, আমিত কাকেও দেখতে পাচ্ছি না।

ঘোষাল একদৃষ্টে চেয়ে রইল জলের দিকে। তার দৃষ্টি উদাস। বেশ খানিকক্ষণ স্থির ভাবে চেয়ে রইল এইভাবে। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলতে লাগল।

এতক্ষণে সন্ধ্যার ছায়া পৃথিবীর বুকে তার আসন পেতেছে। দূরে অনেক দূরে সন্ধ্যাব শাঁখ বেজে উঠল। ঘোষালের হঠাৎ মনে হল রমাও এইরকম নিত্য সন্ধ্যায় তাব ছোট ঘরে শাঁখ বাজাত আর

তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ দেখাত নিশ্চয়ই। আজ সে কাজ হয়ত অন্য কেউ করছে। সন্ধ্যাদেবী সেই নিষ্পাপ বালিকার জন্যে কই না প্রতীক্ষা করছেন! সে পূজারিণী নেই। হঠাৎ ঘোষালের প্রাণের মধ্যে হু হু করে কান্নার বেগ এসে পড়ল। ঘোষাল দ্রুতপদে তার বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করল।

বাড়ীতে ফিরে ঘোষাল দেখল তার বাইরের ঘরে চ্যাটুজ্জো এবং আরও চার পাঁচজন তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। এদের দেখে ঘোষাল একটু খুশী হল। সারাদিন একলা থেকে তার ভাললাগে না। একটু গল্প করতে পারলে মনটা হাল্কা হয়।

চ্যাটুজ্জো তার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে ঘোষাল বললে যে সে এখন ভালই আছে আর শীঘ্রই গঙ্গাস্নান আরম্ভ করবে। কয়েক মিনিট আলাপের পর চ্যাটুজ্জো ও অন্যান্যরা বিদায় নিল।

ঘোষাল বুঝতে পারল যে এইবার তার নিজস্ব জীবন সুরু হল। দিনের আলোতে তার জীবনের কিছুই নেই। রাত্রের আগমনে যখন ধরার বুকে নেমে আসে অন্ধকার তখন সে আনে তার সঙ্গে শান্তির দান, সুষুপ্তির মোহন স্পর্শ। আজ কদিন থেকে ঘোষাল সেই শান্তির দান হতে বঞ্চিত। ঘোষাল মনে মনে বলতে রইল—"হে বিরামদায়িনী নিদ্রা তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। আমাকে বিপন্মুক্ত কর।"

যতই রাত গভীর হতে লাগল ঘোষাল নিজেকে ততই অসহায় বোধ করতে লাগল। আজ সে ঠিক করল অনেক রাত করে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোবে যাতে ভোর পর্যন্ত ঘুমে অচেতন থাকতে পারে। সেই কারণে আজ একটু রাত করে খাবার বন্দোবস্ত করেছে। আজ সে একটু সুস্থ বোধ করছে, বোধ হয় বিকেলে বেড়াতে পারবে।

ঘোষাল রাত এগারটা পর্যন্ত রামায়ণ পড়ল; তারপর আস্তে আস্তে বই বন্ধ করে খাওয়া সেরে নিয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল। শোবার কিছু পরেই অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্নের ঘোরে ঘোষাল দেখল যে সে যতই চেষ্টা করছে কিছুতেই একটা হিংস্র বাঘের কাছ থেকে পালাতে পারছে না। বাঘ তাকে প্রায়

ধরে ফেলে ফেলে এমন সময় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘোষালের কানে এল কারখানার ঘড়িতে আড়াইটা বাজার শব্দ। ঘড়ি বাজার শব্দ তার মাথায় হাতুড়ীর আঘাত করতে লাগল। ঘোষাল উপলব্ধি করল ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। তখনি তার কানে এল ঘরের মধ্যে সেই পরিচিত চলে বেড়াবার শব্দ। ঘোষাল বিপদ অনুভব করল। উত্তেজনায় তার ইচ্ছা হল সে আত্মহত্যা করে। তার সমস্ত শরীর ভিজে গেল ঘামে। আর ত শুয়ে থাকতে পারে না সে। শুয়ে থাকা অসম্ভব। সে ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালাল। চারিদিক ভাল করে দেখল। কৈ? কোথাও কিছু নেই। মাথায় অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুলল। মাথা ও সারা গা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে একটু ভাল বোধ করল। তখন ঠিক করল বাকী রাতটা সে রামায়ণ পড়ে কাটাবে।

কিছুক্ষণ রামায়ণ পড়তে পড়তে তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘোষাল আর বসে থাকতে পারল না। বই বন্ধ করে রেখে আর একবার মাথা ধুয়ে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

রামায়ণ পড়ার সময় যে ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল সে ঘুম এখন কোথায়? ঘুম ত তাকে ছেড়ে গেছে। সে কেন ঘুমের জন্যে ব্যস্ত? তার সমস্ত শরীরে সে একটা জ্বালা অনুভব করতে লাগল। সেই সঙ্গে আবার সেই পরিচিত পদধ্বনি ঘরের মধ্যে। ঘোষাল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। হাতের কাছে পানের ডিবে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে শব্দ অনুমান করে ছুড়ে দিল। ঝন্ ঝন্ শব্দ করে দেয়ালের আলোর কাঁচ ভেঙ্গে পড়ল: ঘোষাল লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে। কারখানার ঘড়িতে তিনটে বাজল। অভ্যাস মত ঘোষাল বারান্দার দরজা খুলে চেয়ে দেখল ইটখোলার দিকে। আবার সেই জ্যোতি, আবার সেই আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে উমা তার দিকে কাঁদ কাঁদ মুখ নিয়ে। নাঃ, ঘোষাল আর সহ্য করতে পারছে না; সে চিৎকার করে বলে উঠল— 'আমি দেখতে চাই না'। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যেতে গেল কিন্তু কি-একটা জিনিসে বাঁধা পেয়ে পড়ে গেল সজোরে আর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হল তার চেতনা।

পরদিন ঘোষাল বেশ দেরীতে উঠল। পড়ে যাওয়াতে তার হাতে ও পায়ে কয়েক জায়গায় সামান্য কেটে গেছে। সমস্ত শরীরে অসম্ভব ব্যথা। এখন বেলা হয়েছে অনেক। ঘড়িতে আটটা বেজেছে। এইবার ঘোষাল আয়নাতে দেখল তার নিজের চেহারা। এ ত' সে ঘোষাল নয়। এযে অন্যরূপ। তার বয়স আরও দশ বার বছর বেড়ে গেছে। এই কদিনে মানুষের চেহারায় এত পরিবর্তন হতে পারে বলে ঘোষাল কখন শোনেনি। আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। উঠে সাজ পোষাক পরে অন্তরের দৈন্য ঢাকতে চেস্টা করল তারপর আয়নায় আর একবার দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বেলা এগারটার সময় থানার বড়বাবু ঘোষালের বাড়িতে এলেন। নীলমণিকে সামনে পেয়ে তিনি ঘোষালের কাছে খবর পাঠালেন। নীলমণির কাছে বড়বাবু জানতে পারলেন যে ঘোষাল কদিন থেকে বড় অসুস্থ কোথাও যায় না। বড়বাবু নীলমণিকে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রায় মিনিট দশেকবাদে ঘোষাল বৈঠকখানার ঘরে এসে নমস্কার করে একটা চেয়ারে বসল।

তার চেহারার পরিবর্তন দেখে বড়বাবু অন্তরে শিউরে উঠলেন। কি চেহারা হয়েছে ঘোষালের? সেই ভরাট নিটোল গাল দুটিতে চোপসানির দাগ আর বলিরেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা দারুণ যন্ত্রণা যেন ঘোষাল মুখ বুজে সহ্য করছে। সেই নিদারুণ কষ্টের ছাপ ঘোষালের মুখে পরিষ্কার ভেসে উঠেছে। বড়বাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কি অসুস্থ? আমি না হয় অন্য সময় আসব।"

ঘোষাল জবাবে বললে—না, না, আমায় কদিন শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে, ও কিছু না, আপনি বলুন।

বড়বাবু বেশ ভাল করে লক্ষ্য করলে ঘোষালের চোখের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা যেন চাপা রয়েছে। ঘোষাল কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।

খানিকক্ষণ চুপ চাপ কাটাব পর বড়বাবু খুনের বিষয় আলোচনা আরম্ভ করলেন। অন্যান্যবারের মত ঘোষাল কোন উৎসাহ দেখাল না। সে যেন বড় নিস্তেজ। বড়বাবু তাকে উদ্দেশ্য করে বললে—দেখুন, রমার শব ব্যবচ্ছেদের সময় ডাক্তার তার বদ্ধ হাতের মূঠোর মধ্যে তুলসীমালার কিছুটা ছেঁড়া অংশ পেয়েছে আর সেই মালায় বাকী অংশটা যে বস্তার মধ্যে রমার মৃতদেহ ছিল তার মধ্যে পাওয়া গেছে।

ঘোষাল হঠাৎ 'অ্যাঁ' বলে বড়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টি অর্থহীন। 'অ্যাঁ' বলতে তার মুখ যে হাঁ হয়েছিল সেই হাঁ অনেকক্ষণ আর বুজল না।

বড়বাবু তাঁর পকেট থেকে আলাদা আলাদা দুটো কাগজের মোড়া বার করে ঘোষালের সামনে ধরে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা দেখুন ত এদুটো চিনতে পারেন কি না!

এক সেকেণ্ড সেইদিকে চেয়ে থাকার পর ঘোষালের নিষ্প্রভ চোখ দুটো উত্তেজনায় চক্ চক্ করে উঠল। সে খপ্ করে বড়বাবুর হাত থেকে ঐ দুটো মোড়া ছিনিয়ে নেবার চেস্টা করতেই, বড়বাবু আগে-থেকেই সাবধান থাকার জন্য হাতটা সরিয়ে নিয়ে দুপা পিছিয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মোড়া দুটি তাঁর পকেটে রাখলেন।

ঘোষাল উঠে বাড়ীর ভেতরে যাবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বড়বাবুর কাছে এসে তাঁর হাতদুটো ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে বললে—আমাকে আপনি বাঁচান, আর কস্টদেবেন না। আমার মান, ইজ্জত, রক্ষা করুন।

বড়বাবু একটু আশ্চর্য্যের সুরে বললেন—"সেকি আপনার আবার কি হল?"

ঘোষাল—আর আপনি আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবেন না বড়বাবু। আপনি আমাকে বাচান। আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব।

বড়বাবু—সেকি? আপনি আমাকে টাকা দেবেন কেন?

ঘোষাল—আচ্ছা আমি আপনাকে সাত হাজার টাকা দেব বড়বাবু আপনি আমার মুখ চেয়ে রেহাই দিন।

বড়বাবু—দেখুন আমি টাকার বিনিময়ে কোন কাজ করি না। আপনি আমাকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে কিছু সুবিধে করতে পারবেন না। আমি টাকার চেয়েও কর্তব্যকে বড় বলে মনে করি।

ঘোষাল আরও মিনতির সুরে বললে—বড়বাবু, আপনি জীবনে কতটাকা উপায় করবেন? আমি আপনাকে পনর না বিশ হাজার টাকা দেব। আপনি আমাকে নিস্কৃতি দিন। আমাকে আর কষ্ট দেবেন না।

বড়বাবু অবিচলিতভাবে বললেন—তা হয় না ঘোষালবাবু। আমার তদন্তে যেটুক সন্দেহ ছিল তা দূর হয়েছে। আমার আর কোন দ্বিধা নেই।

এইবার ঘোষাল একেবারে কৃষ্ণ সাপের মত বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে—বটে, আপনি ভেবেছেন যে আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবেন? আপনি জানেন, আমার নাম হরেণ ঘোষাল? আমি বাঘে হরিণে একঘাটে জল খাওয়াতে পারি? আমার একটা চিঠিতে আপনার মত বড়বাবুর জন্ম মৃত্যু নির্ভর করে তা জানেন? আমি এখনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখে দিচ্ছি যে আপনি আমার কাছে ব্ল্যাকমেল করে টাকা নিতে এসেছেন।

এক নিশ্বাসে এত কথা বলে অসুস্থ ঘোষাল হাঁপাতে লাগল।

বড়বাবু বেশ শক্ত ভাবে বললেন—আপনি চিঠি একটা কেন হাজারটা লিখতে পারবেন। তবে এটা নিশ্চয়ই জানবেন যে আমি অত কাঁচা কাজ করি না। আর বিশেষতঃ আপনার মত মহাপুরুষের মোকাবিলা করার সময়। আমার সাক্ষী সাবুদ সবই আছে।

সাক্ষীর কথা শুনে ঘোষাল একেবারে কুঁচকে গেল।

এদিকে ঘরের মধ্যে গোলমাল শুনে নীলমণি দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। বড়বাবু আর কিছু না বলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। ঘোষাল কি বলতে গিয়ে চুপ করে বসে রইল।

বড়বাবুর মনে আজ আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি ছুটে চললেন চ্যাটুয্যের কাছে। চ্যাটুয্যে সকালের আহার সেরে সবে মাত্র

উঠেছে এই সময় বড়বাবু তার বাড়ীতে এলেন।

চ্যাটুয্যে তাঁকে সমাদরে বসতে দিল।

বড়বাবু চ্যাটুয্যেকে সোজা জিজ্ঞেস করলেন—ঘটনার দিন আপনি যখন প্রথম ঘোষালকে দেখেন তখন তাকে কি অবস্থায় দেখেছিলেন?

চ্যাটুয্যে একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে—আপনি কোন বিষয়ে বলছেন?

বড়বাবু—এই তার জামা, কাপড়, গা, হাত, পা বা শরীরের অন্যান্য কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন কি?

চ্যাটুয্যে একটু ভেবে বললে—আমি ত আপনাকে আগেই বলেছি, ঘোষালের কাপড়, জামা ও জুতোয় আমি কাদার দাগ দেখেছিলাম। তার গলায় তুলসীমালা ছিল না আর গলায় একটা আচড়ের দাগও ছিল। ঘোষাল আমাকে বলেছিল যে সে পিছলে পড়ে যায় সেই জন্যে জামা ও কাপড়ে কাদা লাগে। আমার কাছে লাশের খবর পেয়ে ঘোষাল বাড়ী থেকে জামা কাপড় বদলিয়ে আসে।

বড়বাবু আপনার সঙ্গে যখন ঘোষালের দেখা হয় তখন তিনি কোথায় আর কখন?

চ্যাটুয্যে—ঘোষাল তখন বেড়িয়ে ফিরছিল। সময়টা ঠিক কত আমার স্মরণ নেই তবে বেশ ভোর বেলা। রাত্রে বিষ্টি হয়েছিল আর আকাশটাও মেঘে ঢাকা ছিল। রাস্তায় তখন অন্য কোন লোক ছিল না।

বড়বাবু—ঘোষালের গলায় ত তুলসীমালা আছে দেখা যায় তবে আপনি বলছেন মালা ছিল না।

চ্যাটুয্যে—হাঁ এখন তার গলায় যে মালাটা দেখা যায় এটা আগেকার মালা নয়। আগেকার মালার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই মালার মাঝখানে একটা ছোট রুদ্রাক্ষের দানা ছিল। সে ধরণের মালা এদিকে পাওয়া যায় না। আমি সে মালা দেখলে চিনতে পারি। এখন ঘোষাল যে মালাটা পরে তাতে রুদ্রাক্ষের দানা নেই।

বড়বাবু তখন ধীরে ধীরে তাঁর পকেট থেকে কাগজের মোড়া দুটো

বার করে চ্যাটুয্যের সামনে ধরতে চ্যাটুয্যে একেবারে লাফিয়ে উঠে বললে—বারে! বাঃ, এই ত সেই মালা; এই দেখুন আমি রুদ্রাক্ষের কথা আপনাকে বলেছি এটা সেই। এ ধরণের মালা আমি এ দিকে কখন দেখিনি। আপনি ভাল করে দেখুন এ ধরণের তুলসীমালা এ-অঞ্চলে কেউ ব্যবহার করে না।

চ্যাটুয্যে নিজের মনে বলেই চলেছে কিন্তু বড়বাবুর মন সে দিকে নেই। তাঁর মনে তখন আর এক চিন্তা। তিনি ভাবছেন যে রমার মৃতদেহ যখন ময়না তদন্তের জন্যে পাঠান হয় তখন তিনি ডাক্তারকে বলেছিলেন রমার নখ রাখবার জন্যে। এই নখ পরীক্ষার দরকার আর তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস যে সেই নখের পরীক্ষার দ্বারা মাংসের ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া সম্ভব। বড়বাবুর মনের মধ্যে এই ধরণের চিন্তা হতে তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

চ্যাটুয্যে ভাবল বড়বাবু তাকে অবিশ্বাস করছেন তাই সে বারবার বলতে লাগল—আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন বড়বাবু, ঘোষাল এই রকম মালাই পরত। আপনি আমার সঙ্গে চলুন ঘোষালের ওখানে আমার কথা সত্যি কিনা আপনাকে প্রমাণ করে দেব।

বড়বাবু ততক্ষণে কি করবেন সে বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছেন। তিনি একটু হেঁসে চ্যাটুয্যেকে বললেন– "কে বলছে আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করছি, মোটেই না। আচ্ছা আমি চলি, আবার দেখা হবে।"

চ্যাটুয্যেকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বড়বাবু চলে গেলেন।

চ্যাটুয্যে ব্যাপারটা কি কিছু বুঝতে পারল না। সে ভাবতে লাগল রমার খুনের সঙ্গে ঘোষালের গলায় তুলসী মালার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই এর কোন বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সে ঠিক করল বিকালে একবার ঘোষালের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা কি জানতে হবে। মনে মনে তার বড় কৌতূহল হল।

বড়বাবু চ্যাটুয্যের কাছ থেকে সোজা থানায় ফিরে গেলেন। আজ তাঁর মন আনন্দে ভরে গেছে। এত আনন্দ বোধ হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করার পর নিউটনের কিংবা সোনার মুকুটে কতটা খাদ আছে

তা বার করতে পেরে আর্কিমিডিসের হয়েছিল। আজ বড়বাবু একটা মস্ত জটিলতা ভেদ করে রমার মৃত্যুর রহস্য প্রায় ভেদ করেছেন তিনি ভাবলেন তার আর একটু কাজ বাকি আছে। একবার নীলমণিকে পরীক্ষা করা আর রমার নখটা আজই পরীক্ষা করাতে হবে তাতে মানুষের চামড়ার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা। তারপর হবে এই বহু সমালোচনার সমাপ্তি। নীলমণিকে তিনি একবার থানায় ডেকে পাঠালেন আর তখন পর্য্যন্ত যে সব তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন।

অনুমান আধঘণ্টা পরে নীলমণি বড়বাবুর কাছে এসে পৌছতে বড়বাবু তাকে সামনের চেয়ারে বসবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু নীলমণি বড়বাবুর সামনে চেয়ারে বসতে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত বড়বাবুর হুকুমে সে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ারে বসতে বাধ্য হল।

বড়বাবু ঘোষালের বেশ সুখ্যাতি করে বলতে লাগলেন—আচ্ছা নীলমণি, ঘোষাল বাবুকে আজ বেশ অসুস্থ বলে মনে হল। কি হয়েছে তাঁর তুমি কিছু জান ?

নীলমণি—কি জানি বাবু কি যে অসুখ কিছু বুঝিনা। রাতে ঘুমুতে পারে না। সারারাত পায়চারি করে। কেন যে এমন হল বুঝি না। কাজ কারবারে মন নেই একেবারে। আমার বাপু বড় ভাবনা হয়েছে।

বড়বাবু—কবে থেকে এমন হয়েছে বলত ?

নীলমণি—ঐ যে সেদিন সেই সর্বনেশে মিটিং হল সেইদিন মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই অমন হয়েছে। কি যে হবে কে জানে ?

বড়বাবু কোন ভাল ডাক্তার দেখাতে বল। তোমার বাবুর ত আর টাকার অভাব নেই। উনি ত কথায় কথায় দশ হাজার, বিশ হাজার খরচ করতে পারেন।

নীলমণি—আজ্ঞে হাঁ৷ বসন্ত ডাক্তার ত দেখছে। আজ কদিন থেকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে কিন্তু কোন উপকার হয় নি।

বড়বাবু—নীলমণি ও তোমার বসন্ত ডাক্তারের কর্ম্ম নয়। কোন

ভাল ডাক্তারকে দেখাতে বল। ব্যায়রাম বেড়ে গেলে সারান মুস্কিল হবে, বুঝলে?

নীলমণি—আজ্ঞে বাবু আমিও ত তাই বলি।

বড়বাবু—আচ্ছা নীলমণি ঘোষালবাবু গলায় তুলসীর মালা পরছেন কতদিন থেকে বলতে পার?

নীলমণি—তা আর জানিনে? আমিই ত তেনাকে সঙ্গে নিয়ে বিন্দাবনে গিয়ে কি বলে মালা কিনেছি। অমন মালাটা হারাবার পর থেকেই বাবুর এই রকম অসুখ হয়েছে। সে যে গুরুর মন্ত্রপড়া মালা ছিল বাবু! সেটা যেদিন ঐ মেয়েটার লাশটা পাওয়া যায় সেদিন থেকে দেখছি না। অমন মালা যাবার পর থেকেই এই বিপদ হয়েছে বাবু। আমি যে কি করি বাবু। আমি কিছু ভাবতে পারি না।

বড়বাবু—গুরুর মন্ত্রপড়া মালা কেমন দেখতে তোমার মনে আছে? এখন দেখলে চিনতে পারবে?

নীলমণি— আমি দেখলে চিনতে পারব না? সেই মালার মধ্যিখানে একটা রুদ্রাক্ষের ছোট গোটা ছিল গো। সে মালা আমি নিজে বিন্দাবনে রাধাকুঞ্জের কাছে একটা দোকান থেকে কিনেছি। আমি দেখলেই চিনতে পারব।

বড়বাবু—তাহলে এখন ঘোষালবাবু গলায় যে মালাটা পরেন ওটা আগেকার মালা নয়?

নীলমণি—এটা ত আমি কিনে এনেছি মঙ্গলাহাট থেকে।

বড়বাবু তখন তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছুটি কাগজের মোড়া খুলে নীলমণির সামনে ধরলেন।

নীলমণি দেখেই বলে উঠল—এটাই ত সেই মালা দেখছি ছিঁড়ে গেছে। এ আপনি কোথায় পেলেন? এই দেখুন সেই রুদ্রাক্ষের গোটা রাধাকুঞ্জ থেকে কেনা।

বড়বাবু নীলমণিকে বললেন—তাহলে তুমি ঠিক বলছ যে এটা সেই মালা যেটা তুমি রাধাকুঞ্জ থেকে কিনেছিলে?

নীলমণি—হ্যাঁ বাবু, আপনার যদি পেত্যয় না হয় রাধাকুঞ্জে সেই

বাবাজীকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। সে বাবাজী এখনও আছেন।

বড়বাবুর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আর নীলমণিকে কোন প্রয়োজন নেই। তিনি এইবার নীলমণিকে অন্যান্য দুচারটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। নীলমণি কতদিন ঘোষালের ওখানে আছে, কত টাকা মাইনে পায়, তার দেশ কোথায় সেখানে তার কে কে আছে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করার পর নীলমণিকে বিদায় দিলেন।

নীলমণিও নমস্কার করে চলে গেল।

বড়বাবু এইবার টেলিফোন করলেন বিশেষজ্ঞকে।

রমার যে নখ রাখতে বলা হয়েছিল সেগুলি বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষা করবার জন্যে অনুরোধ করে সেই বিশেষজ্ঞের অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

কোন কেসের তদন্তের সূত্র ধরে যদি প্রকৃত রহস্যভেদ করা যায় তদন্তকারীর আনন্দের আর সীমা থাকে না। যখন এই রহস্য বেশী জটিল হয় তখনত আর কথাই নেই।

বিশেষজ্ঞ পরীক্ষায় ফল জানালেন। রমার নখের মধ্যে ভিন্ন প্রকারের মানুষের চামড়ার অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। আর এও জানালেন যে এটা খিমচানর কারণে হওয়া সম্ভব। পরীক্ষার এই ফল শুনে বড়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—'ইউরেকা'। আজ বড়বাবুর মন থেকে সমস্ত সংশয় দূর হল। তিনি জানতে পারলেন কে কিভাবে রমাকে হত্যা করেছে কিন্তু হত্যার কারণ ঠিক পরিষ্কার হল না।

ডাক্তারের আগের রিপোর্টে বড়বাবু জেনেছেন যে হত্যার অব্যবহিত আগে বা পরে রমাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এইবার বড়বাবুর আবার চিন্তা নেমে এল মাথায়। খুনীই কি তাহলে ধর্ষণ করেছিল? এযে আর এক সমস্যা।

এই কেসের ব্যাপারে অনেক সমালোচনা হয়েছে। ওপর ওয়ালার কাছ থেকে অনেক কৈফিয়তের তাগিদ এসেছে বড়বাবুর কাছে। এই কেসের কিনারা করা বা না করার ওপর তাঁর ভাগ্য নির্ভর করছে একথাও তাঁকে আভাষে জানান হয়েছে। এতদিন তিনি বেশ ভাল

উত্তর দিতে পারেন নি। সন্তোষজনক কোন সন্ধান না হওয়ায় তিনি নীরব ছিলেন যদিও মনে মনে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে এই কেসের কিনারা তিনি করবেনই। আজ এই কেস সংক্রান্ত একটা দীর্ঘ বিবরণী লিখে তিনি উর্ধতন কর্মচারীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এই কেসের তদন্তের বিলম্বের কারণও তাতে বিবৃত করলেন।

নীলমণি বাড়ী ফিরে দেখল যে ঘোষাল চাটুয্যের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইরে যাচ্ছে। এতদিন পরে ঘোষালকে ঐভাবে বাইরে যেতে দেখে নীলমণি মনে মনে বেশ খুসী হল। তার ধারণা হল ঘোষাল বেশ ভাল আছে।

ঘোষাল চাটুয্যের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ খানিকটা এগিয়ে চলল। চৌমাথার কাছে এসে চাটুজ্যেকে বিদায় দেবার জন্যেই ঘোষাল বললে—আমায় একবার বাজারের দিকে যেতে হবে।

চাটুয্যে—'আচ্ছা আমি তবে আসি' বলে সেখান থেকে বিদায় নিল। ঘোষাল ধীরে ধীরে বাজারের দিকে এগিয়ে চলতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঘোষাল যখন ফিরল, তাকে বেশ স্বাভাবিক বলে মনে হল। নীলমণি সবচেয়ে খুসী হল। তার ধারণা হল ঘোষালের অসুস্থতা দূর হয়ে গেছে, আবার আগেকার মত কাজকর্ম চলতে থাকবে। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করল।

ঘোষাল আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে রাতের খাওয়া শেষ করে সময় মত শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। তারপর উঠে বসল। বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বেলে দেয়ালের কাছে তার দুই স্ত্রী ও মেয়ের ফটোর কাছে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে দেখল বাইরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

আজ পূর্ণিমা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাইলেও বেশ বোঝা যায় চাঁদের আলো মেঘের পেছনে আছে। ঘোষাল তার স্ত্রীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। আজ তার চোখের জল যেন

বাঁধ মানতে চাইল না। সে নিজের মনে বলতে লাগল—"আজ আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না। ক্ষমা 'চাইবার কোন মুখ আমার নেই। আমি সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করেছি। আমি তোমাদের ক্ষমার অযোগ্য।"

অনেকক্ষণ কাঁদবার পর তার মনটা একটু হাল্কা হল। সে স্থির করল যে পাপ এ জীবন আর সে রাখবে না। তার এ কলুষিত জীবন রেখে আর কোন লাভ নেই। কিন্তু মরবার আগে তাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিভাবে সে প্রায়শ্চিত্ত করবে? তার ত আর দেরী করা চলে না। কিভাবে তার পক্ষে তা করা সম্ভব? অনেক ভেবে চিন্তে সে স্থির করল যে সে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি করবে। সে লিখে রেখে যাবে তার স্বীকারোক্তি যাতে তার মৃত্যুর পর সকলে জানতে পারে। হঠাৎ তার মনে হল তার মৃতা স্ত্রীরা আর তার মেয়ে উমা একস্বরে তাকে বলছে—কোন ভয় নেই; তুমি স্বীকারোক্তি করে আমাদের কাছে চলে এস।"

তার মনে হল যেন বাইরের বাতাসের শব্দে কারা তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। সেও শ্রদ্ধাভিভূত হয়ে বলতে লাগল—তোমরা আমাকে ডাকতে এসেছ? হ্যাঁ আমি আর দেরী করব না। আমি প্রস্তুত। তোমরা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।"

সামনের পিটুলী গাছে একটা পাখী ডেকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পেঁচা ভীষণ কর্কশভাবে বাড়ীর কার্ণিশে ডাক দিল। ঘোষালের মনে হল যেন কেউ আর্তনাদ করে উঠল। আজ ঘোষাল নির্ভয়। একবার ইটখোলার দিকে চেয়ে দেখল কিন্তু তার কোন ভয় হল না। সে আপনমনে বলতে লাগল—নাঃ, আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার ভাববার কোন কারণ নেই।"

এইবার ঘোষাল আস্তে আস্তে গিয়ে বসল তার ড্রয়ারের কাছে। ড্রয়ার থেকে কাগজ কলম বার করে লিখে যেতে লাগল একমনে। পাতার পর পাতা লেখা শেষ করে যখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল তখন রাত দুটো। ভাল করে চিঠি খামের মধ্যে পুরে খামের মুখ এঁটে ঠিকানা।

লিখল। একবার ঘরের চারদিক দেখে নিল। তার মনে হল আজ তার শেষ দেখা। কাল আর কিছু দেখতে পাবে না। আবার কোথায় জন্মাবে তখন যদি ভুলে এই পথে আসে তখন কি আর কেউ তাকে চিনতে পারবে? তার বর্তদিনের কথা মনে পড়ে গেল। বিশেষ করে তার মনে পড়ল তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর কথা। তার চোখে জল এসে গেল। কিন্তু দুর্বলতা তার চলবে না। সে শক্ত হয়ে বসল। ভগবানের উদ্দেশে বলতে লাগল—হে প্রভু আমি সত্যিই তোমার বড় অধম সন্তান। আজ আমি তোমার কৃপা ভিক্ষা করছি না। কৃপা ভিক্ষা করবার দাবী আমার নেই। তোমার যা বিচার তাই আমি মাথা পেতে নেব। আমি কেবল তোমাকে আমার শেষ প্রণাম জানাই। ঘোষাল প্রণাম করে খানিকক্ষণ। বেশ শান্তভাবে বসে রইল।

বাইরে জোরে হাওয়া বইতে রইল। ঘোষালের মনে হতে লাগল যেন তার জানা, অজানা বহু অদৃশ্য আত্মা তাকে ডাকছে—চলে এস, চলে এস।

ঘোষাল উঠে দাঁড়াল। তার বাক্সখুলে বার করল একটা আফিমের মোড়ক। তারপর ধীরে সেই মোড়াটি খুলে আফিমের গোলাটি মুখে পুরে দিল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার স্ত্রী আর মেয়ের ছবির দিকে। তারপর ক্রমে ক্রমে জ্ঞানশূন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘোষালের দরজা খুলল না। নীলমণি কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোন সাড়া পায় না। এগারটা বেজে গেল। ঘোষাল উঠল না। নীলমণি আবার এসে জোরে ধাক্কাধাক্কি ডাকাডাকি করেও যখন কোন সাড়া পেল না তখন সে বড় বিচলিত হয়ে পড়ল। নীলমণি একজন কর্মচারীকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে নিজে থানায় চলে গেল।

বড়বাবুকে সঙ্গে করে এনে নীলমণি দেখল যে ঘোষালের ঘরের দরজা জোর করে খোলা হয়েছে আর বসন্ত ডাক্তার ঘোষালের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। ঘোষাল মৃত।

নীলমণি দেখামাত্র "বাবুগো" বলে ডুকরে কেঁদে আছড়ে পড়ল।

বড়বাবু পুলিশের কর্তব্য পালনে তৎপর হলেন। তিনি সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রারম্ভিক তদন্ত শেষ করে ঘোষালের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

এই সময়ে তাঁর নজরে পড়ল টেবিলের ওপর একটা বন্ধখামের ওপর। চিঠিটা বড়বাবুকে লেখা। চিঠিটা তুলে নীলমণিকে দেখাতে সে বললে যে ঐ লেখা তার বাবুর। নীলমণি তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। নীলমণি আর অন্যান্য কর্মচারীরা কথার জবাব দেবে কি কেবল চিৎকার করে কাঁদছে।

বড়বাবু তাঁর নামে লেখা চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন। প্যাডের ছয়পাতা দীর্ঘ চিঠি, বড়বাবুকে সম্বোধন করে লেখা—

নমস্কার বড়বাবু।

এই চিঠি যখন আপনার হাতে পড়বে তখন আমি অনেক, অনেক দূরে চলে যাব। সকলের নাগালের বাইরে। সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্যের অনেক দূরে, সমস্ত জিজ্ঞাসার বাইরে। আপনার সততা, ও সত্যবাদীতার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে যে বাদানুবাদ হয়েছে তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। আপনার তদন্ত ঠিকই। আমিই রমার হত্যাকারী। কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমাকে কৃপা করুন এ আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমি সারা জীবনই অত্যন্ত সংযমী ও সৎচরিত্রের লোক। আমার এ লেখা পড়ে আপনি নিশ্চয়ই হাসবেন; তবে একথা নিশ্চয়ই জানবেন যে মৃত্যুপথ যাত্রী কখন মিথ্যা কথা বলে না। আমি জীবনে কখন মিথ্যা আচরণ করিনি। তবে কি করে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমার দ্বারা সম্ভব হল? সেই কথাই বলব। আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন আমাকে বলতে হবে আর এই হবে আমায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

আমি ভগবানকে কোনদিন চোখে দেখিনি কিন্তু তাঁর শাস্তি আমি পেয়েছি। অনুশোচনায় আজ কদিন আমার অন্তরে যে জ্বালা আমি অনুভব করেছি তা অন্যকে বোঝান সম্ভব নয়। আজ আমি সেই অনুশোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাই। কিভাবে মুক্ত হব?

মুক্ত হব আমার প্রাণের আহুতি দিয়ে। তার আগে আমি অকপটে সমস্ত ঘটনা বলতে চাই।

রমা মেয়েটিকে আমি আগে কয়েকবার দেখেছি। সে আমার কাছে আসত হাতে কাটা পৈতা বিক্রী করার জন্য। কোনদিন তার দিকে আমি অসৎ উদ্দেশ্যে চেয়ে দেখিনি। যেদিন রমার মৃতদেহ পাওয়া যায় তার আগের দিন দুপুরে রমা আমার কাছে পৈতা বেচতে আসে। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। কর্মচারীরা সকলে গিয়েছিল মঙ্গলা হাটে। নীলমণিও বাড়ীতে ছিল না। ঐ দিনটিতে বোধ হয় আমার অন্তরের সুপ্ত পশুবৃত্তি জেগে ওঠার ভাল সুযোগ পেয়েছিল। সেদিন রমার চেহারার মধ্যে আমি যে কি দেখেছিলাম তা বলতে পারি না। আমি একটা বড় ভয়ানক রকম প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হলাম। কেন যে এমন হল তার যুক্তি আমি আজও খুঁজে পাই নি। আমার মন বলল, যেমন করে হোক রমাকে আমার চাইই। আমি একদৃষ্টে রমার গতিপথে চেয়ে রইলাম। তার গতির প্রত্যেকটি ছন্দ আমার অন্তরে আলোড়ন জাগিয়ে তুলল।

লেখনা লিখতে লজ্জা পাচ্ছে বড়বাবু, আমি রমাকে অনুসরণ করলাম। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর রমা একবার পেছনে চেয়ে দেখল। সেও বোধ হয় ভাবতে পারে নি যে আমি তাকে এই ভাবে অনুসরণ করব। সে আমার পুরাণ ইটখোলার দিকে চলতে লাগল। আমার মন বলল—এই সুযোগ হারিও না। আমি জোরে চলতে লাগলাম। এখন আমি ভাবলে আশ্চর্য্য হই কি করে আমি এভাবে তার পিছনে ছুটলাম।

বড়বাবু সবই অদৃষ্ট। সত্যই মুণিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। বড়বাবু আমি ছুটলাম। রমা যেন ব্যাধদৃস্ট হরিণীর মত ক্ষিপ্রগতিতে আমার পুরাণ ইটখোলার মধ্যে অদৃশ্য হল। আমি অন্ধের মত ধেয়ে গেলাম। রমার নাম ধরে ডাকতে সে স্থির হয়ে দাড়াল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি তাকে ধরে ফেললাম······।

রমা একবার চীৎকার করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমি দুহাতে

তার কণ্ঠরোধ করেছিলাম। সে বাঁচবার জন্য শূন্যে হাত ছুড়ে বোধ হয় কোন আশ্রয় খুঁজছিল কিন্তু কে তাকে আশ্রয় দেবে? শূন্যে হাত ছোড়বার সময় কিভাবে আমার গলার তুলসীমালাটা তার হাতের মুঠোয় মধ্যে এসে পড়ে। সে সেইটাই আঁকড়ে ধরে। তার হাতেব টানে আমার গলার মালাটা ছিঁড়ে যায় আর তার নখের খামচানি লাগে আমার গলায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে রমা একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। তার আর কোন সাড়া নেই। সব শেষ হয়ে গেল।

এতক্ষণে আমি আমার কাজের গুরুত্ব বুঝতে পাবলাম। ছি ছি! এ আমি কি করেছি? হরেন ঘোষাল! এই কি তোমার শিক্ষাদীক্ষা ও আভিজাত্যের আসল রূপ? আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হল কিন্তু পারলাম না। আমার চিন্তা হল কেমন করে এই জঞ্জাল থেকে উদ্ধার পাই। সেই সময়ে আমার বুকের মধ্যে শত শত হাতুড়ী পড়তে লাগল। কি করব কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল বুঝি বুকটা ফেটে যাবে। হঠাৎ মাথায় কি খেয়াল হল, রমার মৃতদেহ থেকে কাপড়, জামা ছাড়িয়ে কিছুদূরে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে আসি। তারপর চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়ে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ভাবে অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ীব দিকে যেতে আরম্ভ করলাম। প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছিল যে বোধ হয় কেউ দেখে ফেলবে।

এই ভাবে শঙ্কাকুল মনে বাড়ীতে পৌছে ঠিক করলাম যে রাত্রের অন্ধকারে মৃতদেহ অন্য কোথাও ফেলার ব্যবস্থা করব। এই রকম মনে হবার কারণ আমি তখনও বুঝতে পারি নি। এই মনে হওয়াই আমার কাল হল। আমার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হল যে এখানে মৃতদেহ থাকলেই আমার দোষ হবে। কিন্তু এ কাজ করা আমার একলার পক্ষে সম্ভব নয় আবার এটা পাঁচজনকে বলাও যায় না। তখন ভাবতে লাগলাম কি করে এটা সম্ভব হয়। অনেক চিন্তা করে আমার মনে পড়ল নেতা ডোমের কথা। এ লোকটা মদের লোভে সব কিছু করতে পারে। আমি সোজা তার কাছে দু বোতল মদ নিয়ে গেলাম।

নেতা আমাকে আগে থেকেই চিনত। আমার কাছে অনেক

উপকার সে পেয়েছে এর আগে। মদের বোতল পেয়ে এক গাল হেসে বললে—তা দা'ঠাকুর কি মনে করে এলে? এদ্দিন পরে নেতাকে মনে পড়ল বুঝি?"

আমি নেতাকে বললাম—"দেখ নেতা আমার ইটখোলায় কে একটা মেয়েকে মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। এটা আমার জায়গা থেকে অন্য কোথাও ফেলতে হবে তা না হলে থানা পুলিশের হাঙ্গামা হবে।"

নেতা পুলিশের হাঙ্গামা খুব ভাল জানত। মদ খেয়ে মাতলামির জন্যে অনেকবার সে ধরা পড়েছে। সে আমার কথায় রাজী হয়ে গেল আর বললে—দা'ঠাকুর তুমি যখন আমাকে এত ভালবাস আমি সব ঠিক করে দেব। তুমি নিশ্চিন্দ থাক। তাকে দশ টাকার নোট দেখালাম আর বললাম যে এ দিন রাত্রে সে আমার ওখানে খাবে আর শোবে। মাঝ রাত্রে যখন সকলে ঘুমাবে তখন আমাদের কাজ সারা হবে। নেতাকে আমি সাবধান করে দিলাম যে এ সমস্ত কথা যেন ঘুণাক্ষরে কেউ না জানতে পারে।

নেতা উত্তরে আমাকে বললে—"আপনি পাগল হয়েছ দা'ঠাকুর আমি কি কচি খোকা?"

সেদিন রাত্রে কোন রকমে খাওয়া সেরে আমি বাইরের ঘরে বসে রইলাম। যথা সময়ে নেতা এল। আমি তাকে খাওয়ার ঘরের পাশে শুতে দিলাম। কেউ কোন সন্দেহ করে নি কারণ এর আগে নেতা অনেকবার আমার কাছে এসেছে ও আমি তাকে বাইরের ঘরে শুতে দিয়েছি। নেতাকে সকলেই চিনত। আমি আমার ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে বই পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে রাত দুটো। তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের সামনে রাখা কতকগুলো ধানের ওজনের বস্তা থেকে একটা বস্তা আর পাটের দড়ি নিয়ে পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেলাম। নেতা তখন ঘুমে অচৈতন্য। বোধ হয় সারা দুনিয়ায় একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই ঘুমিয়ে আছে। নেতাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে আমার ঘরের পেছন দরজা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি

চলতে লাগলাম ইটখোলার দিকে। যাবার সময় দরজা বাইরের থেকে বন্ধ করে দিলাম।

তাড়াতাড়ি ইটখোলার পাড়ে গিয়ে সেখান থেকে নেতাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম কোথায় আছে। নেতা পাড় দিয়ে নেমে গেল আর কিছু পরে বস্তা কাঁধে করে উঠে এল। সেই সময় দূরে কারখানার ঘড়িতে আড়াইটা বাজল। নেতা বস্তাটা ঘাড়ে করে পায়ে হাঁটা রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে চলতে লাগল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে রইলাম সারা দিনের ঘটনা। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নেতা ফিরে এসে বললে যে তার ইচ্ছে ছিল বস্তাটা গঙ্গার জলে ফেলে দেবে কিন্তু মানুষেব কাশির আওয়াজ পাওয়াতে পথের ধারে একটা ঝোপের আড়ালে ফেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এসেছে।

গঙ্গায় না ফেললেও, আমার ইটখোলা থেকে অনেক দূরে ফেলেছে এতে আমি স্বস্তি পেলাম। আমি নেতাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বিদায় দেখার সময়, আর একবার তাকে সাবধান করে দিলাম। ঠিক সেই সময় কয়েকটা বাদুড় আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। আমার মনে হল তারা আমার এই অন্যায় কাজের সাক্ষী হয়ে রইল।

প্রথম রাত্রে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় সামান্য সামান্য জল জমে আছে। একটু আধটু কাদাও আছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যে কোন সময়ে আবার বর্ষা নামতে পারে।

নেতা অন্ধকারে চলে যাবার অনেক পরেও আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আমার পা দুটো মনে হল যেন কেউ মাটির সঙ্গে আটকে রেখেছে। আমি ভাবতে লাগলাম জীবনের সুরে কোনখানে বোধ হয় ছন্দপতন ঘটেছে। আব আমি মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই। যখন বাস্তবের মধ্যে ফিরে এলাম তখন একটু ভয় হল মনে। তাইত। আমার মনুষ্যত্বকে আমি হারালাম। দুচোখে অশ্রুর বন্যা বয়ে যেতে লাগল। ইচ্ছা হল গঙ্গাব ঘাটে একটু বসে অশান্ত মনকে একটু শান্ত করব। যন্ত্র-

চালিতের মত গঙ্গার ঘটে গিয়ে বসলাম। তখনও রাতের পুরা অন্ধকার। গঙ্গায় ভরা জোয়ার। ঘাটের দুই তিনটি ধাপ ছাড়া অন্য সমস্ত জলের তলায়। ঢেউ গুলো ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগল। তারা আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল—আমরা তোমার এই মহাপাপের সাক্ষী রইলাম।

অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। ঢেউয়ের তালে তালে কত কথাইনা আমার মনে হতে লাগল। এই সময় মনে হল সকাল হতে বোধ হয় বেশী দেরী নেই। লোকজন জাগবার আগেই আমি বাড়ী ফেরবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাই। আমার জামা, কাপড়, জুতো সমস্ত কাদায় মাখামাখি হল। আমি ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে ফিরলাম।

ঘরের পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। না, এখনও কেউ জাগেনি। এইবার পেছনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালাম। আমি সকালে বেড়াতে যাই তাই কারোও সন্দেহ হবার নয়। আমি একটুখানি বেড়িয়ে বাড়ী ফেরবার পথে চ্যাটুজ্জোকে দেখতে পাই। সেও আমার মত রোজ সকালে বেড়ায়। আমার কাদা মাখা জামা কাপড় দেখে মনে হল সে কিছু সন্দেহ করেছে তাই আমি তাকে বলি যে আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। চ্যাটুজ্জো কতটা আমার কথা বিশ্বাস করেছিল তা আমি বলতে পারি না।

আর একটা কথা, আপনি আমাকে যেদিন প্রথমে বলেন যে রমার হত্যাকারী নিশ্চয়ই তুলসীর মালা পরত তখন আমার মনে হয় হয়ত ইটখোলায় আমার ছেঁড়া মালাটা পড়ে আছে। তাই আপনি চলে যাবার পরই আমি সেখানে যাই। অনেক খুঁজেও আমার মালার কোন সন্ধান আমি পাই নি। তারপর রমার লুকান কাপড় চোপড় দেখি ঠিক আছে। আপনি আমাকেই ইটখোলায় খোঁজাখুঁজি করতে দেখেছিলেন টর্চ জ্বেলে।

আজ আমার কোন কথা গোপন করার ইচ্ছা নাই। বিধির কি বিড়ম্বনা দেখুন, রমার হাতের মুঠোতে আমার গলার মালার কিছু অংশ

পাওয়া গেল আর বাকীটা পাওয়া গেল বস্তার ভেতরে একি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি ?

চ্যাটুজ্যে আজ এসেছিল। সেও মালার কথা জানতে পেরেছে। তবে ঘটনা বা অপরাধীর বিষয়ে কতটা জানতে পেরেছে বলতে পারি না। আজ না জানলেও শীঘ্রই জানতে পারবে।

আপনি নেতা ডোমের খবর করবেন আর রমার কাপড় জামা দেখবেন আমার কথা মত।

বড়বাবু, আপনার সততায় ও কর্তব্যনিষ্ঠায় আমি যথার্থ মুগ্ধ। আমি আশা করেছিলাম টাকার সাহায্যে সবই সম্ভব। আমার এ ধারণা যে ভুল তা আপনি প্রমাণ করেছেন।

আমার মত একটা নীচ প্রকৃতির লোকের কথায় আপনার কিছু যাবে আসবে না। আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার মঙ্গল কামনা করি।

আমার মৃত্যুর পর আপনি যদি একটুও দুঃখ প্রকাশ করেন তাহলেই আমার যথেস্ট হবে। চির বিদায়—

হতভাগ্য হবেন ঘোষাল।

চিঠিটা পড়ে বড়বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দূরে চেয়ে রইলেন স্থির ভাবে। ততক্ষণে ঘোষালের মৃতদেহ সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মূল্যবোধ

রাজেন ঘোষাল একজন দক্ষ পুলিশ কনস্টেবল। তার দক্ষতা সর্বজন বিদিত। যে কোন কাজে রাজেনকে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়। যেমন করেই হোক কার্যসিদ্ধি হবেই। রাজেনকে যখন যে কাজে পাঠান যায় সে কখনও কোন ওজর আপত্তি জানায় না। সে কাজ দিনেই হোক বা রাতেই হোক, রাজেন সব সময় এগিয়ে আসে হাসি মুখে। থানার যেমন সবলে রাজেনকে ভালবাসে সেই রকম থানার এলাকায়ও যে রাজেনের সংস্পর্শে এসেছে সেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এই ত সেদিন বামন পাড়ায় হৈ চৈ ব্যাপার। গাঙ্গুলীর ছোট ছেলে রাস্তায় খেলা করতে করতে রাস্তার পাশে একটা পুকুরে পড়ে গেল। ছেলেটির মা সেই পুকুর ঘাটেই সবে মাত্র কাপড় কাচা সেরে সিঁড়ির দুটো কি তিনটে ধাপ ওপরে উঠেছে ওই সময় ছেলেটি জলে পড়ে গেল। তাঁর চিৎকারে আশে পাশের দশ বার জন লোক সেখানে এসে কি করবে ভাবছে। রাজেন থানারই কি কাজে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। চিৎকার শোনামাত্র পুকুর পাড়ে এসে যেই দেখল যে একটা ছেলে জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর কোন কথা নয়, গায়ের জামা আর পায়ের জুতো পাড়ে ছেড়ে একলাফে জলে লাফিয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে ছেলেটাকে নিয়ে পাড়ে উঠে তার শুশ্রূষা করতে লেগে গেল। তার অক্লান্ত চেষ্টায় ছেলেটি বেঁচে গেল। ছেলের মা এতক্ষণ মন্ত্র মুগ্ধের মত রাজেনের দিকে চেয়ে ছিল। ছেলেটি যেই 'মা' বলে কেঁদে উঠল দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে নিল আর তার দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। রাজেনকে আশীর্বাদ করল—বাবা দীর্ঘজীবী হও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন রাজেন ফাঁসাতলার হাওড়ের ধার দিয়ে লাঠি হাতে সরকারী কাজে কোথায় যাচ্ছে। হঠাৎ চিৎকার শুনল—ও বাবাগো, বাঁচাও গো। কান খাড়া করে কোন দিক থেকে

শব্দ আসছে শুনে—দেখল, তারি পেছন দিকে একটা বিশ বাইশ বছরের চাষার মেয়ে তার দিকে ছুটে আসছে আর সেই মেয়েটির পেছনে তীর বেগে ছুটে আসছে একটা কেউটে সাপ। ব্যস্ মুহূর্তের মধ্যে রাজেন ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হাতের পাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলে মেয়েটাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে চলল।

এই ধরনের খবর প্রায়ই শোনা যেত। রাজেনকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

চাঁদের একদিক আলোয় ঝলমল করে কিন্তু আর একদিক ঘোর অন্ধকারে ঢাকা।

কর্মদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ রাজেনের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করল এস্, পির কাছে। অধিকাংশ অভিযোগই দুর্নীতির। রাজেন অন্যায় ভাবে পয়সা নেয়। এস্ পি কয়েকটা অভিযোগ নিজেই তদন্ত করে দেখেছেন কিন্তু কোন অভিযোগই প্রমাণ অভাবে দাঁড়ায়নি। এদিকে অভিযোগের সংখ্যা একের পর এক বেড়েই চলতে লাগল। এস্. পি খুব বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর বিরক্ত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাজেন অবৈধ ভাবে পয়সা আদায় করে। কিন্তু শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি রাজেনকে ধরতে পারলেন না।

অভিযোগ আসা কিন্তু বন্ধ হল না। প্রায় রোজই রাজেনের নামে অভিযোগ আসতে লাগল।

এস্. পি. গোপনে থানা থেকে খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে রাজেন প্রকৃতই কাজের লোক। কর্তব্যে কোনদিন অবহেলা করে না। তিনি রাজেনের নব গুণের পরিচয়ও পেলেন কিন্তু রাজেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এত বেশী আসতে লাগল যে শেষে এস্. পি. তাকে ঐ থানা থেকে বদলী করে অনেক দূরে এক থানায় পাঠিয়ে দিলেন। যে থানায় তাকে বদলী করলেন সেখানকার বড়বাবুকে একটা গোপন চিঠিতে জানালেন যে রাজেনকে যেন সব সময় চোখে চোখে রাখা

হয়। তাকে বাইরের কাজে যেন একেবারে না পাঠান হয়। যদি সম্ভব হয় তাকে থানা পাহারা দেবার ডিউটিতে যেন কেবল রাখা হয়।

থানার বড়বাবু এস্. পির কাছে এই চিঠি পেয়ে এস্. পির ইচ্ছামত রাজেনকে থানা পাহারা দেবার ডিউটি ছাড়া আর অন্য কোন কাজে পাঠান না।'

রাজেন কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করতে লাগল। সে নিজেই থানার বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিল। তাকে দেখেও একেবারে মনে হয় না যে সে কোন অসুবিধায় আছে।

এস্. পি মাঝে মাঝে বড়বাবুর কাছ থেকে খবর নেন। এইভাবে চলল প্রায় এক মাস। রাজেনকে কেউ কোনদিন অভিযোগ করতে শোনে নি যে তাকে কেবল একই ডিউটি কেন দেওয়া হয়। বড়বাবুও রাজেনের ব্যবহারে খুব প্রীত হলেন। তিনি রাজেনের কর্তব্য নিষ্ঠার-তারিফ করতেন। অনেক সময় অনেককে তিনি রাজেনের দৃষ্টান্ত দেখাতেন। তাদের বলতেন তারা যেন রাজেনের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে।

এই সময় একদিন এস্. পির অফিস থেকে বড়বাবুর কাছে একটা জরুরী চিঠি এল। চিঠির মর্মার্থ এই যে ঐ থানার এলাকায় বসবাসকারী অঘোর মণ্ডল নামে এক মারাত্মক ডাকাত একটি ডাকাতি কেসে বিচারে দায়রা আদালতে দোষী সাবাস্ত হয় এবং বার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সাত বছর জেল খাটার পর জেলখানায় তার মৃত্যু হয়েছে নিউমনিয়ায়। এই খবরটা তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ডাকাতের স্ত্রী যে গ্রামে বাস করে সেই গ্রাম থানা থেকে সাত ক্রোশ দূরে। ঐ মুহূর্তে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে। থানাতে একজনও লোক নেই যাকে এখনই পাঠান যায়। বড়বাবু মহা মুস্কিলে পড়লেন। একমাত্র রাজেন আছে কিন্তু এস্. পির নিষেধ আছে তাকে বাইরের ডিউটিতে পাঠাতে। বড়বাবু বিশেষ ভাবে চিন্তায় পড়লেন। খবরটা বিশেষ জরুরী। এখনই না পাঠালে নয়। কি করবেন বড়বাবু কিছুই

ঠিক করতে পারলেন না। তার আশা ছিল অনেক সময় গ্রামের চৌকিদার থানাতে আসে অনেক রকম কাজে। তিনি কয়েক ঘণ্টা চৌকিদারের অপেক্ষায় কাটালেন, কিন্তু কোন চৌকিদার সেদিন থানায় এল না। এদিকে খবর পৌছাতে দেরী হবে দেখে বড়বাবু স্থির করলেন যে রাজেনকেই পাঠাবেন। তিনি মনে মনে বিচার করলেন যে রাজেন যদি দুর্নীতি পরায়ণও হয়, মৃত্যু খবর পৌছে দিতে সে আর কি দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারবে। এই সমস্ত ভেবে তিনি রাজেনকে ডিউটির কাগজ লিখে দিয়ে কি করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন আর বার বার তাকে বুঝিয়ে বললেন যেন সে কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসে। যেন কোন অন্যথা না হয়।

রাজেন যাবার জন্য কোন ব্যগ্রতা দেখাল না। সব কাজ যেমন সে ধীর, স্থির ভাবে করে, সেই রকমই ধীর, স্থির ভাবে বড়বাবুর কাছ থেকে ডিউটির কাগজ নিয়ে থানা থেকে রওনা দিল। তখনই প্রায় বেলা গড়িয়ে এসেছে। সাত ক্রোশ রাস্তা হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে আসা বড় সোজা কাজ নয়। একদিনেই ফিরে আসা অতি কষ্টসাধ্য। রাজেন বললে যে সে রাতের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফিরে আসার চেষ্টা করবে।

বড়বাবু মুখে খুশীর ভাব দেখালেও মনে মনে বেশ চিন্তিত রইলেন। রাজেন যদি কোন অন্যায় করে তাহলে তিনি কি কৈফিয়ত দেবেন এস্‌ পির কাছে?

একমাস পরে রাজেন বাইরে বেরিয়েছে। মুক্ত নীলাকাশ, গাছ-পালা তার কাছে বড় ভাল লাগল। সে কতদিন এমন মুক্ত হাওয়ায় বের হয় নি? সে কতদিন থানার মধ্যে বন্দীর জীবন যাপন করেছে? আজ সে মুক্ত। সে চলতে থাকল। সাতক্রোশ রাস্তা ত কম নয়। চলতে চলতে তার মনে পড়ল তার নিজের গ্রামের কথা সেখানে আছে তার বিধবা মা, স্ত্রী আর দুটি ছোট ছেলে মেয়ে। কতদিন সে বাড়ী যায় নি। তার মেয়ে এতদিনে অনেক বড় হয়েছে। এইবার সে কিছুদিন ছুটি নিয়ে যাবে একবার তার দেশে। দুবছর আগে যখন

সে বাড়ী থেকে আসে তখন তার মেয়ের বয়স ছিল সাত বছর। মেয়ে তাকে আসবার সময় বলেছিল—বাবা তুমি এখানে চাকরী কর; তুমি অন্য কোথাও যেও না। সেই ছোট মেয়েটার কাঁদ কাঁদ মুখটা দেখে তার নিজের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। দু'বছর হয়ে গেছে সে এইবার আবার বাড়ী যাবে।

সাতক্রোশ রাস্তা চলতে চলতে কত কথাই তার মনে এল আর গেল। অবশেষে যখন যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাল তখন বেশ গাঢ়-অন্ধকার চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। গ্রামের দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করে সে অঘোর মণ্ডলের বাড়ী খুঁজে পেল কিন্তু অঘোরের স্ত্রী ঘরে নেই। তার দুই নাবালক ছেলে একজন দশ বছরের আর অন্য জন আট বছরের। এই দুজনকেই সঙ্গে নিয়ে সে পাশের গ্রামে তার বাপের বাড়ী গেছে একদিনের জন্যে। রাজেন ঐ গ্রামেরই একজনকে দিয়ে মণ্ডলের স্ত্রী আর ছেলেদের খবর পাঠাল। তার কাছে বলেও দিল যে ব্যাপারটা বেশ জরুরী। খবর পাওয়ামাত্র যেন মণ্ডলের স্ত্রী তার ছেলেদের নিয়ে চলে আসে।

রাজেন দেখল যে সেই রাত্রে তার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয় তাই সে রাত্রে থাকার মত একটা আস্তানা বেছে নিল মোড়লের বাড়ীর কাছে।

রাতটা কোন রকমে কেটে গেল। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে অঘোরের স্ত্রী দুই ছেলে নিয়ে রাজেন যেখানে ছিল সেখানে এসে হাজির হল।

রাজেন বেশ গুছিয়ে যা বলার প্রয়োজন সমস্তই অঘোরের স্ত্রীকে বললে। অনেক সমবেদনাও জানালে।

অঘোরের স্ত্রী মাটিতে পা ছড়িয়ে দিয়ে খুব কাঁদতে লাগল। মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটল। তারপর রাজেন অঘোরের স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে—আরে এখনই এত কাঁদছ কেন? কাঁদবার সময় পরে আরও পাবে। অঘোরের স্ত্রী বুঝতে পারে না রাজেনের কথা। সে চোখ মুছে রাজেনের দিকে চেয়ে থাকে তার কথার মানে বোঝবার চেষ্টা করে।

রাজেন অঘোরের স্ত্রীকে তার দুই ছেলেকে তার কাছে আসতে বলে। রাজেনের কথায় অঘোরের স্ত্রী তার দুই ছেলেকে এনে দাড় করায় রাজেনের সামনে।

রাজেন এতক্ষণ একটা কাঠের তক্তার ওপর বসে ছিল। সেখান থেকে উঠে ছেলে দুটোর হাত ধরে বললে—এই দুটোকে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। এদের বাবার বার বছর হাজত হয়েছিল। সেত মোটে সাত বছর খেটেছে আর বাকি পাঁচ বছর কে খাটবে? এই দুটো ছেলে বাকিটা খেটে পিতৃঋণ শোধ দিক। তাই ওদের নিয়ে যাচ্ছি বলে তাদের নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। ছেলেদুটো চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

অঘোরের স্ত্রী একেবারে হতভম্ব। এই দুটো ছেলেকে ছেড়ে দেবার জন্যে সে রাজেনের হাতে পায়ে ধরে মিনতি জানাতে লাগল।

রাজেনের মুখে এক কথা—আমি ত অধর্ম করতে পারব না। বার বছর মেয়াদের সাত বছর খাটা হয়েছে বাকি পাঁচ বছর খাটার লোক চাই। এরাই সেই বাকি মেয়াদ খাটার উপযুক্ত। এরাই খেটে শোধ দেবে।

অঘোরের বাড়াতে কান্নার রোল উঠল। অঘোরের স্ত্রী যত কাঁদে তত কাঁদে তার ছেলে দুটো।

অবশেষে রাজেনের মনে দয়া হল। সে গম্ভীর ভাবে বলল—আচ্ছা যখন তোমাদের এতই কষ্ট হবে তখন একটা উপায় আমি করব তোমাদের জন্যে। কিন্তু বড় কঠিন কাজ তুমি কি পারবে?

অঘোরের স্ত্রী এতক্ষণ অকূলে ভাসছিল। এখন হাতে স্বর্গ পেয়ে বলল—কি কাজ? আমি নিশ্চয়ই পারব।

রাজেন ঠিক আগের মতই গম্ভীর হয়ে বললে—আরে আমার ত মনেই ছিল না। একটা উপায় আছে। যদি উচিত মূল্য ধরে দাও—তা হলে ছাড়তে পারব নইলে নয়।

তখন সেইখানে রাজেন অনেক বদান্যতা দেখিয়ে অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল। আর এও বললে যে মূল্যও

অনেক। সেও অঘোরের স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতি বছরের জন্যে একশ টাকা কিন্তু এত মূল্য অঘোরের স্ত্রী কোথায় পাবে। সে সবদিক বিবেচনা করে কম করে মূল্য ধরল পঞ্চাশ টাকা। অঘোরের স্ত্রী যদি ঐ মূল্য দিতে পারে তাহলে সে চেষ্টা করে দেখবে। পাঁচশ টাকার কমে ঐ অপরাধের মূল্য হতেই পারে না তবে রাজেন অঘোরের স্ত্রী আর ছেলেদের মুখ চেয়েই এই কম মূল্য ধার্য করল।

অঘোরের স্ত্রী অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে তখনই স্যাকরা ডেকে তার গলার সোনার হারটা পঞ্চাশ টাকায় বন্ধক রেখে সেই টাকা মূল্য ধরে দিয়ে রাজেনের বদান্যতায় মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেল।

অঘোর মণ্ডলের মৃত্যু সংবাদ ঠিকমত জানান হয়েছে বলে রাজেন তার ডিউটির কাগজে গ্রামের মাতব্বরের সই নিয়ে থানায় ফিরে ঐদিনে যথাসময়ে জমা দিয়ে দিল।

আবার সে থানার ডিউটিতে বহাল হল।

রাজেনের এই মূল্য ধরে নেবার খবরটুকু আবার এস্ পির কাছে পৌঁছাল বটে কিন্তু রাজেন ঠিক তার কর্তব্য পালন করে চলল।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

ভগবানকে পেতে গেলে সোজাসুজি তাঁর কাছে পৌঁছান যায় না। চাই পুরহিতের সাহায্য। পুরহিত ছাড়া যত আবেদন নিবেদনই করা যাক না কেন ভগবানের কাছে পৌঁছবে না। সেখানে পৌঁছতে গেলে যেতে হবে নির্দ্দিস্ট পথে। মৃত্যুর পরেও যে, সোজা যমরাজের কাছে গিয়ে বলব—হুজুর আমি আপনার কাছে আমার বক্তব্য রাখছি আপনি শুনে বিচার করুন, তা হবে না। সেখানে বসে আছেন চিত্রগুপ্ত মশাই আসর জাঁকিয়ে। তাঁকে এড়িয়ে গেলে যমরাজ যদিও কিছু মনে না করেন, তিনি যে একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়বেন। দোষগুণের খাতা তাঁর কাছে। সব তাঁর ইচ্ছে। যদি একবার বিগড়ে গিয়ে দোষের ঘরে বেশী নম্বর দিয়ে দেন তাহলে যমরাজেরও সাধ্যি নেই সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করা। তেমনি ইষ্টদেবতা বড় একটা রাগ করেন না। রাগ করলে চলবে কেন ইষ্টদেবতা ত ওসবের বাইরে তিনি ত মানুষের মত রাগ করতে পারেন না কিন্তু তাঁকে পেতে হলে গুরু চাই। তিনি রুস্ট হলে আর উপায় নেই।

আদালতেও ঠিক তাই। পেশকারকে বাদ দিযে হাকিমের কাছে পৌঁছানর ধৃষ্টতা যেন কার না হয়। এখানে এই পেশকারই হচ্ছে পুরহিতকে পুরহিত, গুরুকে গুরু আবার চিত্রগুপ্তকে চিত্রগুপ্ত। এর কাছে আছে খতিয়ান যেটা বাদ দিয়ে হাকিমের কোন অস্তিত্ব নেই। বড় বড় দুঁদে উকীলও এই মরজগতের চিত্রগুপ্তের কাছে টুঁ শব্দটি করতে পারে না। সকলেই এই চিত্রগুপ্তের কাছে কৃপাপ্রার্থী।

সকাল থেকে একের পর একজন উকীল এসে চিত্রগুপ্তকে অনুরোধ করছে তার মক্কেলের কেসটা যেন শেষে ওঠান হয়। চিত্রগুপ্ত তার চেয়ারে বসেই বাঁ হাতটা টেবিলের তলায় প্রসারিত করে দেয়। সবার অগোচরে তাঁর হাতে কিসের স্পর্শ অনুভূত হয়। তিনি উকীলবাবুকে আশ্বস্ত করে তাঁর মক্কেলের কেসের নথীটা সকল নথীর নীচে রেখে

দেন। উকীলবাবু সন্তুষ্ট হয়ে চলে যান।

আবার আর একজন উকীল আসেন। তাঁরও ওই একই আর্জি। তাঁকেও ঐভাবে সন্তুষ্ট করে তাঁর কেসের নথাটা সব নথীর নীচে রাখা হয়। এমনিভাবে পনরটি কেসের নথী পনরজন উকীলকে সন্তুষ্ট করার জন্য নীচে রাখাতে নথীর অবস্থা প্রথমে যা ছিল তাই হয়। যে উকীলের প্রকৃত সময়ের দরকার ছিল তার কেসটাই আগে ডাকা হয়ে যায় এবং হাজির না থাকায় তারিখ হয়ে যায়।

এতাই চলে এই খেলা। সব উকীলই জানেন কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ করেন না। এইটাই রেওয়াজ।

অতনু রায় পেশকারী করেন একজন Honorary Magistrate এর কোর্টে। হাকিমের বয়স প্রায় ৫৫/৬ বছর। ধীর সৌম্য চেহারা। অতি দয়ালু শান্ত কিন্তু বড় খিটখিটে। তার নাম নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। সকলেই তাঁকে ভক্তি করে।

এরই কোর্টে মামলা।

আসামী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপুরুষ চেহারা ২৮/২৫ বছর বয়স। তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ। এক হোটেলে ক্যাসমেটের বাক্স ভেঙ্গে টাকা নেবার অপরাধে হরিহর ধরা পড়ে হাজতে আছে। অভিযোগ যদিও চুরির তবে চোরাই মালের দাম আনুমানিক দশ টাকা।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ানে ঐদিন পনরটা কেসের শুনানি হবে বলে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রতিটি কেসে একজন বা দুজন করে সাক্ষী নেওয়া হয়ে থাকে তা না হলে সময় হয় না।

একটি করে কেসের ডাক হচ্ছে আর চিত্রগুপ্ত হাকিমের কাছে কাগজ এগিয়ে দিচ্ছে। সাক্ষীর জবানবন্দী হবার সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ানটি বন্ধ করে চিত্রগুপ্ত কোর্ট ঘরের দরজার বাইরে সেইকেসের আসামী এবং উকিলের সঙ্গে জরুরী কথা সেরে ভেতরে আসছেন। আসবার সময় ধীরে ধীরে পা ফেলে আসছেন দুহাতে পকেট দুটো চেপে ধরে বোধহয় যাতে কোন শব্দ না হয়। আবার নিজের জায়গায় বসে পরের কেসের জন্যে হাত বাড়িয়ে কাগজ দিচ্ছেন হাকিমকে।

এইভাবে চার পাঁচটি কেস হবার পর ডাক পড়ল আসামী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আসামী কোর্ট হাজতেই আছে। পয়সার অভাবে জামিন নেবার চেস্টা করতে পারে নি। কোন উকিলও দিতে পারে নি তার পক্ষে। আসলে হরিহরের বাবা একজন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। হরিহর খারাপ সঙ্গে মিশে চুরি করতে শেখে। তার বাবা অধিকাংশ সময় কাজের জন্যে বাইরে থাকতেন তাই ছেলের লেখাপড়ার জন্যে একজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন। নিয়মমত বই খাতা পেন্সিল সবই কিনে দিতেন। স্কুলের মাইনে ও শিক্ষকের মাইনে দিতেন এবং মনে করতেন যে তাঁর কর্ত্তব্য তিনি ঠিক পালন করছেন কিন্তু একদিনের জন্যেও তিনি নিজে দেখেন নি গৃহশিক্ষক কেমন পডাচ্ছে বা ছেলে কেমন পড়া শিখছে।

ছেলে এদিকে দেখল যে কোনদিকে কোন অনুশাসনের বালাই নেই। সে পাড়ার যত বদমাইস ছেলেদেব সঙ্গে মিশতে লাগল তারপব তাদেব সঙ্গে গিয়ে হোটেল ও রেস্টুরেণ্টে যেতে শিখল। বন্ধুদের নিয়ে খেতে গেলে পয়সা চাই। সে পয়সা তাব কোথায়? বন্ধুদের পাল্লায় পডে স্কুলের মাইনের টাকা চুরি করতে শিখল। দুমাস স্কুলেব টাকা না দেওয়াতে ও স্কুল থেকে তার নাম কেটে দিল। সে আর স্কুলে যেত না। বাড়ীতেও কিছু বলল না কিন্তু স্কুলেব প্রত্যেকমাসের মাইনেব টাকা নিয়মিত নিয়ে বন্ধুদেব সঙ্গে স্ফূর্ত্তি করে কাটাতে লাগল। হরিহরের বাবা একদিনও দেখলেন না ছেলে স্কুলেব ফীস্ ঠিকমত জমা দিচ্ছে কিনা। এই করতে করতে বাৎসরিক পরীক্ষা এসে গেল। হরিহর এইবার একটু চিন্তিত হল কি করবে। অনেক ভেবে চিন্তে তার মার কাছে টাকা চাইল। স্কুলের ফীস প্রায় ৭০৲ টাকা বাকী। মার কাছে টাকা আছে। মা ছেলেকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন যাও আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি কিন্তু তোমাব বাবাকে জানিও না। মন দিয়ে লেখাপডা কর।

একসঙ্গে সমস্ত বাকী টাকা স্কুলে জমা দিয়ে হরিহর পরীক্ষায় বসল বটে কিন্তু সেভেন থেকে এইটে উঠতে পারল না।

এইবার হরিহরের বাবার টনক নড়ল। তিনি স্কুলের হেড্ মাস্টারের কাছে গিয়ে জানতে পারলেন হরিহর সাত মাসের স্কুলের ফীস একসঙ্গে জমা দিয়েছিল আর সাতমাস স্কুলে যেত না, আর স্কুলের খাতায় তার নাম ছিল না। তিনি ফিরে এসে হরিহরকে জিজ্ঞেস করতে সে চুপ করে থাকে কোন জবাব দিতে পারে না। তিনি হরিহরকে বেদম মারলেন আর বললেন যে যদি এবার থেকে মনদিয়ে পড়া না করে তাহলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

হরিহরের মা এসে ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। তিনি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—আহা ছেলেটাকে একেবারে মেরে ফেলবে নাকি? একবার ক্লাসে উঠতে পারেনি তাতে কি হয়েছে? কত ছেলে ত ফেল করে। ও আমাকে বলেছে এখন থেকে ভাল করে পড়বে। আয় হরু তুই আমার সঙ্গে আয়। আহা ছেলেটাকে একেবারে আধমরা করে ফেলেছে। এই বলে হরিহরের গায়ে মাথায় হাত বুলতে বুলতে তাকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

হরিহরের বাবা রাগে গজ্ গজ্ করতে লাগলেন—শাসনের সময় আদর করেই ছেলের মাথাটা খাবে।

মা—হ্যাঁ, এইটুকু ছেলেকে ঐরকম জল্লাদের মত মারার নাম শাসন নয়। তার চেয়ে আমরা দুজনেই তোমার গলগ্রহ আমাদের দুজনকেই আজ মেরে ফেল। সব আপদ চুকে যাক।

হরিহর তার মার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে গেয়ে আরও খারাপ হয়ে গেল। তার বাবা তার জন্যে অন্য একজন কড়া গৃহশিক্ষক রেখে দিলেন। নিজেও সময় পেলে এক এক দিন নিয়ে বসতেন। কিন্তু বড় দেরীতে তিনি যত্ন নেবার চেষ্টা করলেন। তিনি দেখলেন যে হরিহরের একেবারে কোন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানই হয় নি। তাকে কেঁচে গণ্ডূষ করার প্রয়োজন। তিনি আরম্ভ করেও ছিলেন কিন্তু হরিহরের মা শাসন করতে দিতে চাইতেন না একেবারে। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাটি এবং শেষ পর্য্যন্ত হরিহরের মা কেঁদে জিতে যেতেন। হরিহরের বাবা শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টের ওপর

সব ছেড়ে দিয়ে আর হরিহরকে নিজে নিয়ে বসতেন না।

হরিহরের দিন ভালই কাটতে লাগল। মায়ের আঁচলের আড়ালে থেকে সে তার বাবাকে এড়িয়ে চলতে রইল। যে কুসঙ্গে সে পড়েছিল সে সঙ্গ সে ছাড়তে পারল না। তার সঙ্গীরা তাকে অতিদ্রুত নীচে নিয়ে যেতে লাগল।

নতুন গৃহশিক্ষক কয়েকবার অভিযোগ করেছিলেন। হরিহরের মা ইসারায় বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বেতন ঠিক পাচ্ছেন ত। তাঁর আর অন্য বিষয়ে বেশী মাথা ঘামাতে হবে না।

গৃহশিক্ষক অন্যায়কে বরদাস্ত করতে পারবেন না জানিয়ে তাঁর চাকরী ছেড়ে দেন।

দ্বিতীয় বছরেও হরিহর ক্লাসে উঠতে পারল না। তার বাবা আর কিছু না বলে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আমার আর কিছু বলার নেই। আবার পড়ুক আবার চেষ্টা করুক।

হরিহর এদিকে লেখাপড়া ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠল। লুকিয়ে লুকিয়ে সে আজকাল বিড়ি খেতে শিখেছে। দুবেলা খাবার পর সে একবার ছাদে না গিয়ে পারে না। তার এই সময় বিড়ি খাওয়ার একান্ত প্রয়োজন। পাড়ার ছোট মেয়েদের দিকে অশোভন ভাবে চেয়ে থাকা এবং মাঝে মাঝে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করা তার এখন স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। কথা বলতে বলতে দু'চারটে অশ্লীল গালাগাল আজকাল তার মুখে প্রায়ই এসে পড়ে। এ সমস্ত সে সঙ্গদোষে আয়ত্ত করেছে।

হরিহরের মা আজকাল ভাবেন সত্যিই ছেলেটা কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? ছেলের দোষ তিনি দেখতে পান না। তাঁর মতে এগুলো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে।

হরিহর আজকাল আর পাঁচ মিনিট বই খুলে বসতে পারে না। পড়তে বসলে তার কেবল বড় বড় হাই ওঠে। মনটা চলে যায় সেই পচা, পিণ্টু, মদনা, স্বপন ও অন্যান্য সঙ্গীদের কাছে। আজকাল তার এক নতুন বন্ধু হয়েছে মিত্তে পাড়ার কাস্তু। ছেলেটা কেমন বড় বড়

চুল রেখেছে আর কথা বলার মাঝে মাঝে মাথাটা পেছনদিকে ঝটকা মেরে চুলটা দুলিয়ে দেয়। কান্তু ওকে শিখিয়েছে যে বাড়ির বাড়ী থেকে কোন সময়ে ডেকে আনতে হলে নাম ধরে না ডেকে সঙ্কেতের দ্বারা ডাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। যেমন হরুকে যদি ডাকতে হয় তাহলে কান্তু তার বাড়ীর কাছে দুবার হাততালি দেবে। তা ছাড়া আর কেউ জানতেও পারবে না কে তাকে ডাকছে। নাম ধরে ডাকলে অনেকের কাছে জানাজানি হবে কে ডাকছে। তাই বই খুলে বসে থাকলেও সে হাততালির শব্দের অপেক্ষায় বসে থাকে। সেই কারণে বইতে মন বসে না।

কান্তুর ছোট বোনটা কান্তুর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হবে। মেয়েটা দেখতে বেশ। কেমন হরুদা, হরুদা করে গায়ের কাছে ঘেঁষে আসে। তার হাসিটাও বেশ ভাল লাগে। আজ কিছুদিন কান্তুদের বাড়ী যাওয়া হয়নি আর তার বোন মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই হরু আজ বড় উন্মন হয়ে আছে। তার মন চলে গেল কয়েকদিন আগে। একদুপুরে তারা সকলে সরকারদের বাগানে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে বড় বড় পেয়ারা চুরি করছিল এই সময় মল্লিকা চুপিচুপি এসে তাদের সাবধান করে দিয়ে গেল যে সরকার বাবু একটা বড় হান্টার নিয়ে আসছেন। মল্লিকা আগেই পাঁচিলের গা বেয়ে চলে গেল তারপর তারা পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে যাবার পর সরকার বাবুর হান্টারের আওয়াজ পেল বাগানের ভেতরে। সেদিন যদি মল্লিকা আগে থেকে না জানাত তাহলে সরকার বাবুর হান্টারে কারো পিঠের চামড়া থাকত না। মল্লিকা মেয়েটা বেশ। তাকে আর বেশীক্ষণ ভাবতে হল না। তার কানে এসে পৌঁছাল দুবার হাততালির শব্দ। সেই খোলা বইটা বন্ধ করে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল মা কাছাকাছি নেই। তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিট পরে মা ফিরে এসে হরু, হরু করে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে সমস্ত ঘরগুলো খুঁজে দেখে ছাদে গেলেন কিন্তু হরুর কোন পাত্তা পেলেন না। এতদিন পরে তাঁর ভাবনা হল। তাইত!

এই কয়েক মিনিট আগেও এখানে বসে পড়ছিল এর মধ্যে গেল কোথায় ? কিন্তু তিনি বুঝলেন না যে ছেলেকে অন্যায় প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তিনি তার শেষ অবস্থায় এনেছেন। এখনও তিনি অপত্যস্নেহে অন্ধ। এখনও তিনি মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন যে হরু বোধহয় কাছাকাছি কোথাও গেছে এখনই এসে পড়বে।

হরু কিন্তু কয়েক ঘণ্টায় মধ্যেও এল না। যখন তার মা তার খোঁজাখুঁজি করছে তখন সে কান্তর সঙ্গে নতুন আড্ডায় মহানন্দে সময় কাটাচ্ছে। তার ওপর সেখানে আছে কান্তর বোন মল্লিকা। সেখানে যত খোশগল্প করে সময় কাটিয়ে যখন জানল যে তার বাবা অফিসে চলে গেছেন তখন আস্তে আস্তে ক্ষিদের তাড়নায় বাড়ী ফিরল।

এতদিন পরে আজ সে মার মুখোমুখি হয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রথম কড়া কথা শুনল। সে অবাক হয়ে গেল যে তার মা এতদিন তার কোন কাজের কৈফিয়ত চায়নি আজ তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন—হরু কোথায় গেছিলি এতক্ষণ ? তার মার গলার এ-স্বর তার কাছে অপরিচিত। এ যে শাসনের স্বর। হরু হঠাৎ এরকম প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিল না। সে একটু থতমত খেয়ে বললে—আমি, আমি মানে ঐ কান্তদের বাড়ী গিয়েছিলুম। জান মা ওরা ভারী ভাল লোক।

মা এক ধমক দিয়ে বললেন—কে কান্ত ? সকালবেলা পড়াশোনা ছেড়ে ওদের বাড়ী যাবার কি দরকার ছিল ? বুড়ো ধাড়ি ছেলে লজ্জা করে না একই ক্লাসে দু তিন বছর ধরে পড়ছে ? যারা সব ছোট ভাইয়ের বয়সী তাদের সঙ্গে পড়তে হচ্ছে একবার কি মনে ঘেন্নাও আসে না ? কত লোকে কত কথা বলে আমি সব সহ্য করে থাকি। নাঃ আর আমি এখানে থাকব না। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।

হরু ভাল ভাবেই জানত তার মা কোথাও যাবে না। এ কেবল তাকে ভয় দেখান ছাড়া আর কিছুই নয়। সে মুখে কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা—যাও, দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে ? চান করে খেয়ে আমার মাথা রক্ষে কর।

হরু আর দাঁড়াল না। চলে গেল বাথরুমে।

এর পর থেকে হরুর মা নিজের মনে বসে বসে কি ভাবেন তা কেউ জানে না। কখন কখন তাঁর বুকের বাঁ দিকে ভয়ানক ব্যথা করে মাথা ঘোরে কিন্তু কাউকে কিছু বলেন না। তাই নিয়েই কাজ করেন আর যখন বেশী অসুস্থ বোধ করেন তখন কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন।

এই ভাবে কিছুদিন থাকতে থাকতে তিনি সাংঘাতিক খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কদিন ধরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। হরুর বাবা বেশ রাগ করলেন এতদিন তাঁকে না বলার জন্যে। তিনি ভাল ডাক্তার আনলেন কিন্তু ডাক্তার সব পরীক্ষা করে বললেন আড়ালে—হার্ট ত আমি ভীষণ খারাপ দেখছি। হঠাতে এত খারাপ কি করে হল? এখন যা হার্টের অবস্থা সামান্য কোন শক পেলে হার্ট ফেল করতে পারে। আমি ওষুধ ইনজেকশন সবই দিচ্ছি তবে চব্বিশ ঘণ্টা ভাল নার্সিং দরকার। হরুর বাবা দিন রাতের নার্স রাখলেন যদিও হরুর মা আপত্তি করেছিলেন।

এত যে কাণ্ড হরুর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার দিন আগের মতই চলতে লাগল। সে জানে না তার মার কত খারাপ শরীরের অবস্থা। তার বাবাকে একজন রান্নার লোক রাখতে হয়েছে। হরু দুবেলা ঠিক খায়। কখন কখন মার কাছে যায় কিন্তু নার্সের কড়া শাসনের জন্যে দুটো চারটের বেশী কথা বলতে পারে না। বাবার সঙ্গে ত তার কথাই নেই বহুদিন, কারণ সে তার বাবাকে এড়িয়ে চলে।

হরুর মার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে চলতে রইল। ডাক্তার দুবেলা আসেন। ওষুধ প্রায় দু তিন দিন পরপর বদলে দেন কিন্তু কোন উপকার হয় না একটু জোরে কথা বললেই ভীষণ বুক ধড়ফড় করে। কোন একটু শব্দ হলেই চমকে উঠে বুকের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েন।

হঠাৎ দুদিন হরু বাড়ীতে ফিরল না। তার অনুপস্থিতির কথা তার মাকে জানান হল না। তিনি কয়েকবার হরুর কথা জিজ্ঞেস করাতে নার্স বলেছে সে তার ঘরে আছে।

তৃতীয় দিন সকালে পুলিস হরুদের বাড়ী তল্লাসী করার জন্যে এসে হাজির হল। হরুর বাবা পুলিসের কাছে জানতে পারলেন যে হরু, মল্লিকা বলে একটা মেয়েকে নিয়ে কোথায় পালিয়েছে তাই মল্লিকার বাবা হরুর নামে কেস করেছেন এবং ঐ কারণেই পুলিস হরুর খোঁজে এসেছে।

হরুর বাবা তাঁর পদ মর্যাদার সম্মান খুইয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন —আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন, হরু আজ দুদিন বাড়ীতে আসে নি আর মনে হয় আসবেও না। আমার স্ত্রীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ যে কোন সময়ে 'কোলাপস্' করতে পারে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি হরু এলে আমি নিজে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব। আপনারা তাকে গুলি করে মেরে ফেললেও আমি কিছু বলব না।

হরুর বাবার কথাতে পুলিস বিশ্বাস করে ফিরে গেল কিন্তু খবরটা চাপা রইল না। হরুর মার কানে খবরটা ঠিক পৌঁছে গেল কি করে তা কেউই বলতে পারল না।

হরুর মা ঐ খবরটা শোনার পর কয়েকবার কেবল বললেন—হরু শেষ কালে তুই এই কাণ্ড করলি? এও আমাকে শুনতে হল?

ব্যস্ এর পর আর তাঁর মুখ থেকে কোন কথা শোনা যায় নি। তিনি অসহ্য বুকের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তখনি ডাক্তার আনা হল আর তিনি একটা ইনজেকশন ও দিলেন কিন্তু সকল দ্বন্দ্বের অবসান করে তিনি আর চোখ খুললেন না।

এর পর হরু আর বাড়ী ফেরে নি। কেউ তার কোন খবর রাখে নি। তার বাবা ছেলের কু-কীর্তির জন্যে অপবাদ আর স্ত্রী বিয়োগের দুঃখে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চাকরীর সময় পূর্ণ হবার আগেই অবসর গ্রহণ করলেন। সম্পূর্ণ চাকরী করলে তিনি যে পেন্সন পেতেন তা অপেক্ষা অনেক কম পেনসন্ নিয়ে তিনি নিজের বাড়ী একটি ধর্মীয় সংস্থাকে দান করে বাকী জীবন ঈশ্বরারাধনায় কাটাবার বাসনা করে বৃন্দাবনে চলে গেলেন।

তার পর দশ বছর কেটে গেছে। হরুর কোন সন্ধান কেউ

জানে না। এতদিন পরে আজ তাকে আবার ওই অনবারী হাকিমের কোর্টে দেখা গেল।

হরিহর ওরফে হরুর চেহারার মধ্যে ভদ্র সন্তানের ছাপ বেশ ভাল ভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। হাকিম তার অল্প বয়স আর ভাল চেহারা দেখে একটু অনুকম্পা দেখিয়ে বললেন--তোমার ত আকৃতি দেখে মনে হয় তুমি ভাল ঘরের ছেলে। এই নীচ কাজে তুমি কেমন করে এলে?

হরিহর সহজেই হাকিমের দুর্বলতা বুঝতে পারল। সেও চতুর কম নয়। সে তখনি একটা গল্পের অবতারণা করে বলল—হুজুর আমার অল্প বয়সে মা মারা যান। বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেন। সৎমা অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার ও অত্যাচার আরম্ভ করলেন। মাঝে মাঝে খেতে পর্যন্ত দিতেন না। বাবাকে বলে কোন ফল হত না। উল্টে সৎমার উৎপীড়ন বাড়ত। হুজুর লেখাপড়া কিছু শিখতে পারিনি, কোনও কাজ পাই না তাই আমাকে এই হীন কাজে নামতে হয়েছে কেবল পেটের জন্যে।

হাকিম—তা হলেও তুমি কুলি, মজুর বা বাবা মুটের কাজ করলেও আমি খুশী হতুম। এই হীন কাজ করবার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।

হরু মাথা নীচু করে জবাব দেয়—হুজুর সত্যিই আমার খুব অন্যায় হয়েছে। এ ভাবে ত আমাকে কেউ বোঝায়নি আগে।

হাকিম—তুমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছনা? যত পশ্চিমারা এখানে আসে কেবল লোটা আর কম্বল নিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে সামান্য পুঁজি নিয়ে ফেরীওয়ালা হয়ে ছোট ছোট জিনিস ফেরী করতে থাকে। কিছুদিন পরে এই ফেরীওয়ালাই দেখ একটা ছোট দোকান করে বসে আর কয়েক বছরের মধ্যে হয় বিরাট আড়তদার। আমাদের দেশের ছেলেরা দেখ কেবল রকে বসে আড্ডা দিচ্ছে আর কুকুরের মত মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘুরছে। শেষ পর্যন্ত কেবল হা হুতাশ করছে—যা কিছু সব বিদেশীরা লুটে নিয়ে গেল। বিদেশীরা কেন নেবে না? বেশ করবে নেবে হাজার বার নেবে।

হরু—হুজুর আপনি ঠিক বলেছেন। আমি কয়েকবার এই কথাই ভেবেছি কিন্তু টাকার অভাবে কিছু করতে পারি নি।

হাকিম—দেখ ইচ্ছে থাকলে টাকার অভাব হয় না। আমি তোমাকে টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই বলে তাঁর পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট দিলেন। হাকিমের সৎ প্রচেষ্টা ও বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে আদালত ঘরে যারা উপস্থিত ছিলেন প্রায় সকলেই চার আনা, আট আনা করে দিয়ে আরও পনর টাকা হল। ওই পয়ত্রিশ টাকা হরুর হাতে দিয়ে হাকিম বললেন—এই টাকা নিয়ে তুমি ফেরীওয়ালার কাজ সুরু কর। সাতদিন অন্তর আমাকে খবর দিয়ে যাবে কেমন চলছে। আজ আমি তোমাকে কেবল কোর্ট কয়েদের হুকুম দিচ্ছি। তুমি আজই কাজের ব্যবস্থা করবে।

হরু—যে আজ্ঞে হুজুর।

ঠিক এই সময় চিত্রগুপ্ত তার খতিয়ান বন্ধ করে উঠতে যাচ্ছে। হাকিমের নজর সেই দিকে পড়তে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি চিত্রগুপ্তের দিকে চেয়ে বললেন—পেশকার বাবু বসুন। এক্ষেপে আর আপনি বাইরে যাবেন না। দয়া করে ওকে কোর্টের বাইরে যেতে দিন।

চিত্রগুপ্ত হঠাৎ এই ভাবে আদিষ্ট হবার জন্যে তৈরী ছিল না। সে—"আজ্ঞে না, মানে, মানে" বলে ধপ করে তার চেয়ারে বসে পড়ল। তার আর পুরো কথাটা বলা হল না।

মঞ্জুদির হার

থানার দারোগা দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র ছিল। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আর সকলের মত সেও অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখেছিল। তার বাবা ছিলেন একজন সাধারণ কেরানী। এম. এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত রঙীন আশা ফিকে হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা, পরীক্ষার ফল বেরতে দেরী আছে, দেবাশীষ রোজকার মত বাড়ীর কাছে লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করছে এমন সময় পাড়ার একটি ছেলে খবর দিল—দেবুদা, আপনাকে এখনি বাড়ী থেকে ডাকছে, বিশেষ জরুরী দরকার।

কি এমন জরুরী দরকার দেবু বুঝতে পারল না। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে চলে এল। দরজার কাছে পৌঁছতেই, কান্নার শব্দে চমকে উঠল। ভেজান দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল পাশের বাড়ীর বিনতা মাসী ও আরও কয়েকজন মহিলা তার মাকে ঘিরে বসে আছেন। মা তাকে দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন।

দেবু তখনও জানেনা কি ঘটেছে, ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছে মা?

কান্না জড়ানো গলায় মা বললেন, সর্বনাশ হয়েছে, উনি বাস থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছেন, এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি।

অতর্কিত এই দুঃসংবাদের খবরে দেবু ছেলে মানুষের মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তাকে কাঁদতে দেখে বিনতা দেবী বললেন—ছিঃ দেবু তুমি না পুরুষ মানুষ। তোমার কি এখন এভাবে কাঁদা চলে? তোমার বাবা কি রকম আছেন আগে হাসপাতালে দেখে এস। রক্ত দিতে হবে কিনা, কোন ওষুধ লাগবে কিনা সে সমস্ত ব্যবস্থা কর। কত লোক ত গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় আবার জ্ঞান ফিরে পায়। হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন শুনেই কি হতাশ হতে হয়? চল আমার

সঙ্গে আমার মেজ ছেলে অনিমেষকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দুজনে গিয়ে যা করার কর। আমরা এখানে তোমার মার কাছে থাকব।

এই বলে তিনি তাঁর অন্যান্য পড়শীদের দেবুর মার কাছে বসিয়ে রেখে দেবুকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নিজের ছেলে অনিমেষের হাতে একশ টাকা দিয়ে আড়ালে বলে দিলেন খোকা, দেবুর বাবা হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন। অবস্থা ভাল নয়। এই টাকাটা সঙ্গে রাখ যদি কিছু প্রয়োজন হয় আর দেবুকে কাছে কাছে রেখ।

অনিমেষ দেবুর সমবয়সী। যখন তারা হাসপাতালে পৌছাল তার অনেক আগে দেবুর বাবা শুভাশীষবাবু ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁকে হাসপাতালের বারান্দার একধারে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মৃতদেহের চার দিকে লাল কাপড় দিয়ে ঘেরা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন শুভাশীষ বাবুর সহকর্মী বিমানবাবু। তাঁর কাছ থেকে দেবু জানতে পারল যে তিনি এবং শুভাশীষবাবু একই বাসে রোজকার মত অফিস থেকে ফিরছিলেন। বাসে ওঠবার পর শুভাশীষবাবু একবার শুধু বলেছিলেন যে তাঁর বুকের বাঁ দিকে হঠাৎ বড় ব্যথা করছে। প্রায় পাঁচ মিনিট বুকে হাত দিয়ে বসে ছিলেন। বিমানবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাস থেকে নেমে কোন ডাক্তারখানায় যাবেন কিনা কিন্তু তিনি বলে-ছিলেন কোন ভাবনার কারণ নেই, এ রকম ব্যথা তাঁর প্রায়ই হয়। এর পর বাস যখন শুভাশীষবাবুর বাড়ীর কাছের স্টপে দাঁড়ায় তখন শুভাশীষবাবু অতি সাধারণ ভাবে উঠে বাসের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামেন। বিমানবাবু তবু সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু শুভাশীষবাবু তাঁকে বারণ করেন। বিমানবাবু কিন্তু লক্ষ্য করেন শুভাশীষবাবু যেন সাধারণ ভাবে চলতে পারছেন না। বাস ছেড়ে দেবার পর পেছনের রাস্তা থেকে হঠাৎ একটা চিৎকার ওঠে। বিমানবাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজান এবং গাড়ী থেকে নেমে যেখান থেকে চিৎকার আসছিল সেখানে গিয়ে দেখেন শুভাশীষবাবু রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সেখানে বেশ লোকের

ভীড় হয়ে গেছে। বিমানবাবু তাঁকে তখনি ট্যাক্সি করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন কিন্তু ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিমানবাবুর কাছে সমস্ত শুনে দেবাশীষ একটুও কাঁদল না। তার চোখে একবিন্দু জলও দেখা গেল না। পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে সে তার বাবার খাটের দিকে চেয়ে রইল।

বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হবার পর দিনই দুজন পাওনাদার এসে জানাল যে তাদের পাওনা সর্বসাকুল্যে আসল ও সুদ নিয়ে ছয় হাজার তিন শ' পঁচানব্বই টাকা তের আনা। ঐ টাকাটা বহুদিন হতে পড়ে আছে। এই টাকাটা শোধ করার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হবে।

দেবাশীষ জানত না এই টাকাটা কি কারণে পাবেন তাঁরা। তাই সে জিজ্ঞেস করে জানল যে শুভাশীষবাবু তার দুই মেয়ের বিয়ের সময় দুটি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে দশহাজার টাকা কর্জ করেন প্রতি বারে পাঁচ হাজার করে। প্রথম ক্ষেপের টাকা প্রায় চার হাজার শোধ হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেপের প্রায় এক হাজার শোধ হয়েছে। এখনও সুদে আসলে পূর্ব্ব বর্ণিত টাকাটা বাকী আছে।

বাইরের ঘরের পাওনাদারদের সঙ্গে দেবু কথা বার্তা বলছে এবং মাঝে মাঝে একটু তর্ক হচ্ছে শুনে দেবুর মা অনিতা দেবী দরজার ওপার থেকে বললেন দেবু ওদের বলে দাও আমরা একটা পয়সাও মারব না। কর্তার অফিসের প্রভিডেণ্ডফাণ্ড এবং অন্যান্য টাকা পেলে আমরা আগে ওঁদের পাওনা চুকিয়ে দেব। ওঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যদি ওঁরা চান তাহলে আমি ওঁদের লিখে দিতে পারি।

পাওনাদার দুজনে অনিতা দেবীর উদ্দেশে একসঙ্গে বললে—মা তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। আমরা লোক চিনি মা। আজ আমাদের আসবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তবে কি জানেন মা, আমরা ত এমন কিছু লক্ষপতি লোক না। এই সামান্য ব্যবসা করেই খাই। তাই মা তোমার কাছে এসেছি। কোন অপরাধ নিওনা মা।

অনিতা দেবী—না, না, না, অপরাধ নেবার কি আছে। আমরা দেনদার, আপনারা পাওনাদার। দরকারের সময় এক কথায় টাকা

আপনারা দিয়েছেন। আমার অবস্থা ভাল হলে আমি আজই টাকা দিতে পারলে খুবই খুশী হতুম। কিন্তু কি করব বলুন। শোধ দিতে একটু দেরী হবে বটে তবে আপনাদের টাকা মারা যাবে না।

১নং পাওনাদার—টাকা মারা যাবে ? মা যে কি বলে ! চলহে নটবর চল, বলে ২ নম্বরের দিকে ইসারা করলে।

২নং পাওনাদার—তোমার যেমন আর দেরী সয় না ! বললুম অমন ভদ্রলোক শুভাশীষবাবু। তিনি গত হয়েছেন তাতে কি হয়েছে ? টাকা মারা যাবার কোন ভয় নেই। সবে মাত্র শোক পেয়েছেন। আর কয়েকদিন পরে চল। তা তোমার আর তর সয় না। দরজার দিকে চেয়ে বললে—চল বিশ্বম্ভর।

তুজনেই যাবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

কয়েকপা যেতেই একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর তুই পাওনাদারের উদ্দেশে শোনা গেল—দাঁড়ান।

তুই পাওনাদার হঠাৎ এই রকম অনুশাসন শুনে যেন চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাতে সামনে দেখতে পেল এক সুপুরুষ যুবা পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরে চটি পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের কত টাকা পাওনা আছে বললেন ?

তুই পাওনাদারই থতমত খেয়ে একটু ঢোক গিলে প্রায় একসঙ্গেই বললে—আজ্ঞে ছ হাজার তিন শ' পঁচানব্বই টাকা তের আনা।

যুবক—প্রত্যেকের কাছে কত আছে আলাদা ভাবে বলুন।

১ম—আজ্ঞে আমার কাছে (খাতা দেখে) এক হাজার নয়শ তিন টাকা তিপ্পান্ন পয়সা।

২য়—নাকের ওপর থেকে চাঁদির চশমা ভাল করে কাধের চাদরে মুছে) আজ্ঞে আমার কাছে চার হাজার চার শ বিরানব্বই টাকা আঠাশ পয়সা।

তুই পাওনাদারই আগ্রহ ভরে চেয়ে রইল সেই যুবকের দিকে।

যুবক তাঁর ড্রেসিং গাউন থেকে স্টেট্ ব্যাঙ্কের একটি চেক বই বার করে তুই পাওনাদারকে তুখানা আলাদা চেক লিখে দিলেন। তার পর

দেনা শোধ বলে কাগজে লিখিয়ে নিয়ে বিদায় দিলেন দুজনকে।

দুই পাওনাদার খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘটনাটি এত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল যে অনিতাদেবী বা দেবাশীষও প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। পাওনাদার দুজনে চলে যাবার পর অনিতা দেবী ঘরে ঢুকে ছলছল চোখে বললেন—বাবা তুহিন তুমি কেন এত টাকা দিতে গেলে? আমি ত কয়েকমাসের মধ্যেই ওদের সমস্ত পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে দিতুম।

তুহিন—তাতে কি হয়েছে মা? আমার কাছে টাকা আছে আমি দিয়েছি। দেবু বড় হয়ে মানুষ হয়ে আমায় ফিরিয়ে দেবে। (দেবুর দিকে চেয়ে) আমি কিন্তু সুদ এক পয়সাও ছাড়বনা সেকথা এখনই বলে রাখছি।

দেবু—আমি আসলই দিতে পারব না তার আবার সুদ, বলে হেঁসে ফেলল।

অনিতা দেবী—বাবা তুহিন, তুমি যা করলে তার তুলনা হয় না। তোমাকে আমি কি বলে যে আশীর্ব্বাদ করব বাবা। তুমি দীর্ঘজীবি হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

তুহিন শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে দেবুকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে বেরিয়ে গেল।

বাবার অফিসের টাকা মোট আট হাজার পাবার পর তুহিনকে তার টাকা ফেরত দেবার জন্য দেবু আর অনিতাদেবী কয়েকবার চেষ্টা করে-ছিলেন কিন্তু তুহিন বার বার কোন না কোন অছিলায় টাকা নেয়নি। বলেছে থাকনা, টাকাত আমার এখন দরকার নেই। দরকার হলে নেব।

দেবু মার সঙ্গে পরামর্শ করে আট হাজার টাকা থেকে ছ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিল ভাগ্নে নীহারের নামে। এ কথা কেবল দেবু আর অনিতাদেবী ছাড়া আর কেউ জানল না।

এইবার দেবু উঠে পড়ে লাগল চাকরীর জন্যে। আত্মীয়, স্বজন, চেনাপরিচিত যেখানে যে ছিল সকলের কাছেই দেবু গেল কিন্তু

কোন ফল হল না। অনেক চেষ্টার পর সে চাকরী পেল পুলিশের দারোগার।

একবছর ট্রেনিং নেবার পর যখন সে এল তখন তার প্রথম চাকরী হল এক থানায়। সে একলাই থাকত আর মাঝে মাঝে মার কাছে আসত। তার দুই বোন কলকাতাতেই থাকত। তারা মাঝে মাঝে অনিতাদেবীর কাছে আসে। এইভাবে অনিতাদেবীর দিন কেটে যায়।

আরও একবছর কাটল। দেবু মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে। তার একান্ত ইচ্ছে পুলিস বিভাগের দুর্নীতি দূর করে। প্রতিদিন কত প্রলোভন কত আকর্ষণ কিন্তু দেবুকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। কোন পরিশ্রমে সে ক্লান্তি বোধ করে না। সে মনে করে এই পুলিশ বিভাগকে যে যতই নিন্দে করুক না কেন সমাজ সেবায় সুযোগ এখানে যত আছে এ রকম আর কোথাও নেই। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে, তার ওপর যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে তার সদ্ব্যবহার করবে, সাধারণের উপকারের জন্যে। অন্যায় সে কোন দিন করবে না। লোকের উপকার করে সে মহা আনন্দ পায়। এটা যেন তাকে নেশার মত পেয়ে বসে।

কে ভাল কে মন্দ তা প্রচার করার জন্যে ঢাক পিটতে হয় না। সাধারণ লোক ভালমন্দ বিচার করে অতি সহজেই। অল্প দিনের চাকরীতে দেবু দেখেছে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হল নিষ্ঠার। তার ইচ্ছামত বা শক্তিমত অনেক কাজ সে করতে পারে নি কিন্তু তার নিষ্ঠার জন্যে তার কাজে সকলেই খুসী। এতেই তার আনন্দ। সে প্রতিদানে কিছু চায় না।

তুহিনকে তার কাজের জন্যে অনেক জায়গায় যেতে হয়। অনেক লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। তার পরিচিত মহলে সকলেই দেবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দেবুর সুখ্যাতি শুনে তারও মন আনন্দে ভরে ওঠে। সে একদিন দেবুকে বাড়ীতে পেয়ে মার সামনে বললে—মা, আর কতদিন দেবুকে এরকম ধর্মের ষাঁড় করে ছেড়ে রাখবেন? আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে একটা ভাল দড়ি দেখি। অনিতাদেবী প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পেরে হেঁসে বললেন—হ্যাঁ বাবা,

বাঁধবার দড়ি যেন বেশ শক্ত হয়। আমি তোমাদের ওপর ভরসা করে আছি।

দেবু—হ্যাঁ জামাইবাবু, দেখবেন যেন ঠকিয়ে না দেয় আর জালের মতন আপনার পায়ে না আটকে যায়।

তুহিন—না, না কোন ভয় নেই বেশী লম্বা হবে না আর অন্যের পায়ে আটকাবার সুযোগই দেব না।

দেবু—মা, আমায় একটা জরুরী কাজে যেতে হবে। আমি ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরব—বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

মা ও তুহিন দুজনেই হাসলেন। তারপর তুহিন বললে—মা আমি একটা ভাল মেয়ে দেখেছি, গ্রাজুয়েট, দেখতে শুনতে খুব ভাল। অপছন্দ হবার কোন কারণ নেই। ঘরও খুব ভাল। আপনি মত দিলে মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

মা—দেবু বড় হয়েছে, কাজ করছে। একলা একলা এই সময় দূরে থাকাও ঠিক নয়। তোমার যখন পছন্দ তখন তুমি কথা বল। যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। তুমি আর চিত্রা তবু কাছে আছ অনেক দেখা শোনা করছ। নির্মল আর শুভ্রা ত আজ কয় বছর বাইরে। তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই হবে।

ধুমধামের সঙ্গে দেবাশীসের সঙ্গে মালবিকার বিয়ে হয়ে গেল। অনিতাদেবী এবং আত্মীয়-স্বজন সকলেই খুসী এই বিয়েতে।

সময়ের চাকা সামনে চলতে লাগল। দিন চলতে লাগল। দেবু দ্বিগুণ উৎসাহ ও আনন্দে নিজের কাজ নিয়ে আছে। তার কাছে কাজই বড়। সে কর্ত্তব্যকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করে। কর্ত্তব্যের কাছে তার নিজের সুখ দুঃখও কিছু নয়।

মালবিকার কিন্তু এত কাজ ভাল লাগে না। সে চায় রোজ দেবুর সঙ্গে বেড়াতে যাবে। সিনেমা, থিয়েটারে যাবে নাহয় অন্য কোথাও। দেবুর পক্ষে সেটা সব সময়ে সম্ভব হয় না। তার কাজের যা ধরণ তাতে তার সময়ের কোন ঠিক নেই। একদিন দেবু আর মালাবিকা তৈরী হচ্ছে একটা সিনেমা দেখতে যাবে বলে। ঠিক রওনা হবে এমন

সময় দেবুর থানা থেকে খবর এল একটা জরুরী ব্যাপারে তখনি না গেলে নয়। দেবু বাধ্য হয়ে মালবিকাকে তার বোনের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল আর নিজে চলে গেল জরুরী কাজে।

এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। মালবিকা প্রথমে প্রথমে মনে মনে খুব বিরক্ত হত কিন্তু মুখে কিছু বলত না। যত দিন যেতে লাগল সে সুযোগ পেলে দেবুকে বেশ করে শুনিতে দেয়। সে কথায় কথায় বলে —আমার বাবা, কাকা, দাদা তারাও ত চাকরী করে কিন্তু এমন অনাসৃষ্টির কাজ কোথাও দেখিনি। সকলে যখন বাড়ী ফিরে বিশ্রাম করে তখন যত কাজের তাড়া। আমি হলে এ চাকরী ছেড়ে মুটেগিরি করতুম। তাতেই শান্তি ছিল।

এইভাবে আজকাল প্রায়ই খুঁটিনাটি ব্যাপারে দেবাশীষের সঙ্গে মালবিকার মনোমালিন্য লেগেই আছে। দেবু বড় শান্তিপ্রিয়; সে চেঁচিয়ে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না পাছে আসে-পাশের কোয়ার্টারের লোকেরা তাদের ঝগড়াঝাটির বিষয়ে আলোচনা করে। যখন ঝগড়া বাঁধবার মত হয় তখন সে তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

আজকাল মালবিকা দেবুর সঙ্গে কোথাও যেতে চায় না।

একদিন মালবিকা দেবুকে বললে—একটা কথা বলব শুনবে?

দেবু—কি কথা বলনা।

মালবিকা—আমাদের পাশের কোয়ার্টারে মঞ্জুদি কেমন সুন্দর একটা হার গড়িয়েছেন। আমাকে ঐ রকম একটা হার গড়িয়ে দাও।

হারের কথা শুনে দেবু বলল—কেন তোমার ত বেশ ভাল হার আছে আবার কেন?

মালবিকা—সেটা অনেক পুরণ প্যাটান। মঞ্জুদির হারটা একেবারে নতুন ডিজাইনের। আমার খুব পছন্দ ঐ রকম হার।

দেবু- বুঝেছি মালবিকা—কিন্তু আমি অত খরচ করে হার গড়াতে পারব না। অনেক টাকার দরকার হবে।

মালবিকা—কেন, মঞ্জুদির বরও ত তোমার মত দারোগা। তাদের ঘরে গেলে যে সব জিনিস দেখা যায় আহা বেশ ভাল লাগে তুমিও ত

ঐ একই কাজ কর, তোমার ত ওসব নেই। মঞ্জুদি ঠিক কথাই বলেছিলেন যে যাদের কোন রুচি নেই তারাই একঘেয়ে জীবন যাপন করে আনন্দ পায়। সত্যিই তোমার কোন রুচি নেই।

দেবু একটু রুষ্ট হয়েই বললে—দেখ মালবিকা, তোমার মঞ্জুদি কি বলেন না বলেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার রুচি আছে কি নেই সে আমি ভাল জানি তবে এটা ঠিক জেন যে নিজের ক্ষমতা ছাড়া চুরি বা ভিক্ষে করা অর্থে রুচি দেখাবার কোন স্পৃহা আমার হয় না।

মালবিকা—তুমি তাহলে বলতে চাও মঞ্জুদির বর চোর।

দেবু—না, আমি তা বলছিনা, তবে একটা কথা ভেবে দেখ, আমি যে মাইনে পাই তোমার মঞ্জুদির বর তার চেয়েও দশটাকা কম পান। রুচিমত জিনিস আমি যখন কিনতে পারিনা, উনি কেমন করে পারেন? এর তিনটি উপায় থাকতে পারে, চুরি, ভিক্ষে অথবা পৈতৃক সম্পত্তি। এ তিনের কোনটারই সাহায্য আমার নেই।

মালবিকা—আমার অত হিসেবে দরকার নেই। আমি ঐ হারটা তোমায় এনে দেখাব। ঐ রকম হার দেখলে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হবে।

দেবু—না মালবিকা, পরের জিনিস এন না। আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল হলে আমরা নিজেরাই ঐরকম হার গড়তে পারব।

মালবিকা—তুমিত সব সময় ঐ একই কথা বল। অবস্থার স্বচ্ছল হতে হতে আমার আর কেনার শখও থাকবেনা আর বয়সও থাকবেনা।

দেবু—কি করব বল? যে যেমন ভাগ্য করে এসেছে। আমার যেমন আয় আমাকে সেই ভাবেই থাকতে হবে। অপরের দেখে লোভ করে আমার মনে অশান্তি আনতে চাই না। তুমি হার এন না। আমি দেখতে চাইনা।

এর পর দুচারদিন কেটে গেল। মালবিকা একদিন মঞ্জুদির কাছ থেকে সেই হার চেয়ে এনে নিজের গলায় পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে এমন সময় দেবু ঘরে ঢুকে মালবিকাকে ঐভাবে পরের হার এনে পরার জন্যে ভৎর্সনা করল। পরের জিনিস দেখে লোভ করা অতি নীচ

মনের পরিচয় দেয় ইত্যাদি বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দিল। তারপর সে বিরক্ত হয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল তার কাজে বাইরে।

মালবিকার মনটা ক'দিন ধরে ভাল ছিল না। আজ দেবুর ভৎ'সনায় তার মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শাশুড়ী আজ বাড়ী নেই; বড় মেয়ের বাড়ী গেছেন। মালবিকার অন্তরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। সে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

দেবু থানা থেকে প্রায় দুমাইল দূরে একটা কেসের তদন্তে গিয়েছিল। তার তদন্ত স্থানে পৌঁছবার একঘণ্টার মধ্যে থানার বড়বাবুর কাছ থেকে একটা জরুরী চিঠি নিয়ে একজন কনস্টবল তার কাছে এসে চিঠিটা দিল। চিঠিতে লেখা আছে—চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি চলে আসবে। বিশেষ প্রয়োজন। তোমার অপেক্ষায় রইলাম।

বড়বাবু।

দেবু বুঝতে পারলনা হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন হতে পারে। সে কনষ্টবলকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে কিছু জানে না। তাড়াতাড়ি সাইকেলে চড়ে ফিরে এল। তার কোয়ার্টারের সামনে অনেক লোকের ভীড়ের মাঝখানে বড়বাবুও রয়েছেন। তিনি দেবুকে দেখেই বললেন—ভাই বড্ড দেরীতে খবর পেয়েছিলাম। দরজা ভাঙ্গতে দেরী হল। যখন ভেতরে যেতে পারলাম তখন সব শেষ।

দেবু তখনও বুঝতে পারেনি কি সব শেষ। তাকে ঐ রকম হতচকিত দেখে বড়বাবু বললেন—ভাই, মালবিকা কেরোসিন গায়ে ঢেলে আত্মহত্যা করেছে।

দেবু তার ঘরের সামনে বারান্দায় দেখল মালবিকার আধপোড়া-দেহ। আগুনে পুড়ে আর চেনবার উপায় নেই। সে সেইদিকে চেয়ে ভাবতে রইল মঞ্জুদির গলার হারের কথা, যেটা আর কেউই জানে না।

সমাপ্ত